অস্তিত্বের সংঘাত

আমার জমিন, আমার দ্বীন

আবু উসামা

অস্তিত্বের

সংঘাত

আমার জমিন, আমার দ্বীন

আবু উসামা

সূচিপত্র

উৎসর্গ

আবরার ফাহাদ সহ হিন্দুত্ববাদ এর মোকাবেলায় এই জমিনের সকল শহীদদের।

বিজয় কখনো রক্ত বিসর্জন ছাড়া অর্জিত হয় না। যারা একে এড়িয়ে যেতে চায় তারা দুর্বল। যারা একে নির্মমতা হিসেবে দেখে, হয় তারা নিজেদের ইতিহাস জানে না, নয় তারা পরাজিত।

ভূমিকা

আমরা আন্দালুস থেকে বিতাড়িত হয়েছি। আল আকসার পবিত্র ভূমি আমাদের থেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। হিন্দের ভূমিতেও আজ আমরা অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখি হয়েছি। শত বছর ধরে মুসলিম প্রধান ভূমিগুলোতে রাব্বুল ইজ্জতের হাকিমিয়্যাহকে বিলুপ্ত করে বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদীদের হাকিমিয়্যাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জি*হা*দের তরবারিগুলো নত করে আমরা যতটা শান্তিকামী হয়েছি, আমাদের শত্রুর কাছে আমাদের জান, মাল, ইজ্জত তত মূল্যহীন হয়েছে। ফিলিস্তিন, সিরিয়া, ইরাক, আরাকান, কাশ্মীর, উইঘুর জুড়ে মাজলুম মুসলিমের আর্তনাদ যত তীব্র হয়েছে, অনুভূতির দুয়ারে কড়া লাগিয়ে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে আমরা তত মত্ত হয়েছি। আমাদের বিরুদ্ধে কুফফারদের ষড়যন্ত্র যত গভীর হয়েছে, কুফফারদের চাপিয়ে দেওয়া স্বাধীনতা, সমতা, অধিকার এর বুলি শুনে, ওদের চাকচিক্যপূর্ণ কুফরী জীবনাদর্শের প্রতি আমাদের মুগ্ধতাও তত গভীর হয়েছে। এভাবেই চলছে.....

এই বইতে মোটাদাগে ৩ টি বিষয়বস্তু তুলে ধরতে চেষ্টা করেছে এই অধম-

১। ইতিহাস এর পাতা থেকে উদ্ধারকৃত বাঙালি মুসলিমের আত্মপরিচয়ের ডিসকোর্স নির্ধারণ।

২। সমকালীন রাজনীতির খন্ডচিত্র থেকে ক্রম অগ্রসরমান গা*জ*ও*য়া*তু*ল হি*ন্দের বাস্তবতা উন্মোচন।

৩। গেরুয়া আগ্রাসন মোকাবেলায় দ্বীন ও উম্মাহর অস্তিত্ব রক্ষায় আমাদের করণীয় নিরূপন।

লেখক হিসেবে এই অধম একদমই আনকোরা। ভবিষ্যতে আবার কখনো কলম ধরবো সেই সম্ভাবনাও নেই। উম্মাহর খিদমতে সময়ের চাহিদা বুঝে, বিষয়বস্তু অনুযায়ী কলম চালিয়েছি কখনো ধারালো ভাষায়, কখনো দরদের সহিত। আমার সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি পাঠক মহল ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আশা করি। এই বইয়ের পাতায় পাতায় উঠে আসা আমার লেখনী গুলো পাঠকদের চিন্তার দুনিয়ায় ঝড় তুলবে এটাই প্রত্যাশা।

আমাদের চিন্তাবৃত্তিয় সংশোধনীর বার্তা দেবে এই বই ইন শা আল্লাহ। একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়, পুরো বইটি লিখতে ইসলামী রাজনীতি বিশ্লেষক লেখক কারিম শাওন ভাই এর চিন্তাধারা আমাকে দারুন প্রভাবিত করেছে। বইটিকে আপনারা আপন করে নেবেন এবং বার্তা গুলো ব্যাপক করে সমাজের প্রতিটি স্তরে পৌঁছে দেবেন ইন শা আল্লাহ, এই আশা ব্যক্ত করছি।

আবু উসামা

২২-০৫-২৪

সকাল ৪:০০

সংকটকালীন বাস্তবতা

মুমিনদের কাফেলাগুলো আজ সুন্নাহকেন্দ্রিক ইখতিলাফি আলোচনায় ইফতিরাক-এ জড়িয়ে গেছে। আমাদের ওয়ালা বারা আজ নিজ মাসলাক-কেন্দ্রিক ইখতিলাফি দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উরফকে অস্বীকার করে তাফাররুদাত এর অনুসরণকে দ্বীনের সহীহ অনুসরণ হিসেবে সাব্যস্ত করে নিজেদের একঘরে করে ফেলেছে।

ফিরকাতুন নাজিয়ার আলোচনায় আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতকে সকলের নিজের অনুসৃত মাসলাকের দিকে নিসবত করতে ব্যস্ত।

দ্বীন অনুসরণের ক্ষেত্রে আকাবিরদের সাময়িক ওজরকে আজ দলিল সাব্যস্ত করে গোমরাহির সব পথ উন্মোচিত হয়েছে।

উলামায়ে কেরাম নিজেদের আদর্শে আজ ইরজার চাষাবাদ করে তাওহীদবাদীদের খুরুজ-এর দায় দিয়ে বৃহত্তর উম্মাতে মুসলিমাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছেন।

ইসলাহী মজলিসগুলোকেই আজ ঈমানী চেতনার বাতিঘর বলে বিবেচনা করা হচ্ছে।

নিজ মারকাজ টিকিয়ে রাখার খিদমতকেই সর্বস্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

অসাম্প্রদায়িকতার বয়ানে আল ওয়ালা ওয়াল বারা এর আমল সমাজ থেকে উঠে গেছে।

মুসলিম শাসকের আনুগত্যের নাম দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের মতো কুফরি মতবাদকে সাংবিধানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা তাগুত, গাদ্দার গোষ্ঠীর আনুগত্যের সবক শোনানো হচ্ছে মিম্বর থেকে।

কে শাহাদাতের মর্যাদা পাবে, আর কে জাহিলিয়াতের উপর মারা গেল, জানাজা পড়ানোর সময় ইমামগণ আর ফারাক করেন না।

সুদখোর, ঘুষখোর মসজিদ কমিটির কাছে জিম্মি হয়ে মসজিদের খতিবগণ আর ঈমান-কুফরের সীমানা উম্মতের কাছে স্পষ্ট করেন না। মুমিনের শিবির আর কাফেরের শিবির উম্মতের কাছে আজ স্পষ্ট না।

এই সেক্যুলার বিশ্বব্যবস্থায় মডারেট ইসলামের একচ্ছত্র অনুসরণকেই আজ দ্বীনদারিতার নমুনা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

মিডিয়ার প্রোপাগান্ডায় ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মহড়ায় জিহাদী আলোচনা আজ হয় উগ্রবাদ নাহয় আবেগী আলাপ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

তাই, দ্বীন ও উম্মাহর নিরাপত্তার প্রশ্নে শাপলা থেকে নাসিরনগর, নাসিরনগর থেকে ভোলা, ভোলা থেকে শহীদবাড়িয়া, শহীদবাড়িয়া থেকে বায়তুল মোকাররম, বায়তুল মোকাররম থেকে ফরিদপুর, ফরিদপুর থেকে মধুখালীতে যখনই হিন্দুত্ববাদী, মুশরিক ও তাদের এদেশীয় পেটোয়া মুরতাদ

বাহিনীর আগ্রাসনে মুমিনদের তাজা রক্তে রঞ্জিত হয় আল্লাহর জমিন, তখনই মুমিনের আবেগের দুনিয়ায় লেলিহান অগ্নিশিখার আস্ফালন দেখা যায়।

কিন্তু, এই আবেগ স্থায়িত্ব পায় অতি অল্প সময়ের জন্য। ইন্টারনেট সেবা আজ যতটা সহজলভ্য তার চেয়েও বেশি সস্তা হয়ে গেছে আজ মুমিনের রক্তের মূল্য। তাই তো, শহীদের রক্তের দাগ না শুকাতেই ইস্যুপ্রিয় বাঙালি মুসলিম প্রতিদিনই একেক ভাইরাল টপিকে আলোচনার ঝড় তোলে অনলাইনে।

অথচ, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের কাছে বায়তুল্লাহর চেয়েও মুমিনের জান-মালের দাম বেশি।

কিন্তু, তার আসমানি ইশারা আমলে নেবে এই সময় কোথায় বান্দার? আমরা প্রতিনিয়ত নিজেদের সাথে নিজেরাই জুলুমে লিপ্ত। নিজেরাই নিজেদের দাসত্বের শৃঙ্খলকে ভারী করে তুলেছি।

তরবারির আঘাতের জবাব তরবারির ভাষাতেই দিতে হয়। আর তরবারির ভাষায় পাল্টা জবাব দিতে গেলে গড়ে তুলতে হয় দুর্দমনীয় তাওহীদি আদর্শ। সেই আদর্শের দাওয়াত সর্বস্তরে বারুদের ধোঁয়ার মতো করে ছড়িয়ে দিতে হবে বিপ্লবের মঞ্চ তৈরির জন্য। জিহাদের তরবারিগুলোকে সমুন্নত করার জন্যই এই উম্মতকে কাফেলাবদ্ধ হতে হবে। আর উম্মত কাফেলাবদ্ধ হলেই হিন্দুত্ববাদী ত্রাসের মোকাবেলা করা সম্ভব।

চেতনার ফেরিওয়ালা

“আমি আগে বাঙালি, পরে মুসলিম” নামক অহমিকা ভরা যে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা আমাদের মস্তিষ্কে গেঁথে দেওয়া হয়েছে, এই চেতনা কি আদৌ আমাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত? জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে ও দেশের সার্বভৌমত্ব ধরে রাখতে শাসকবর্গ বারবার আমাদের বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার নির্দেশ দেয়। বুদ্ধিমান মাত্রই প্রশ্ন করবে, “এই গালভরা চেতনামন্ত্র কি আমাদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য নাকি বিচ্ছিন্ন করার জন্য? জাতি হিসেবে আমাদের সার্বভৌমত্ব প্রকাশের জন্য নাকি আমাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য?”

আমাদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য চেতনার যে আগ্রাসন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য আমাদের মগজে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে ‘বাংলাদেশ’ নামক রাষ্ট্রের বানোয়াট এক ইতিহাস। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে, ৭ মার্চ এর উত্তপ্ত ভাষণের প্রেক্ষাপট, মুজিবনগর সরকার গঠন, বুদ্ধিজীবী হত্যা প্রসঙ্গ, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তাজউদ্দীন আহমদের মতো কমিউনিস্টদের দৌরাত্ম্য এবং শাসনতন্ত্রের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে চালানো অ্যাকশন, ১৫ই আগস্ট সংঘটনের প্রকৃত কারণ সম্পর্কিত ইতিহাস আমাদের আবার নতুন করে জানতে হবে। নিজেদের বীরত্বগাঁথা তুলে ধরতে ইতিহাসবিকৃতি ঘটাতে বিজয়ী জাতি কোন ঘাটতি রাখে না।

কারণ নিরপেক্ষ ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া কেউ আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠার পথে শক্তিশালী বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম। আর দাদার উপরেও দাদা থাকে।

চেতনার আগ্রাসন

প্রতি বছরই পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে মঙ্গল শোভাযাত্রার মাতম ওঠে প্রগতিশীল সেক্যুলার পাড়ায়। তাদের ভাষ্যমতে এটা হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, তাদের বাঙালিয়ানার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

প্রশ্ন জাগে, বাঙালি আত্মপরিচয়ের এই ন্যারেটিভ কি আদৌ ৪৭-এর দেশ বিভাগের সময় ছিল? তবে তো পশ্চিমবঙ্গ ভারত নয়, আমাদের বাংলাদেশের অংশ হতো। বাস্তবতা হচ্ছে, ইসলামকেন্দ্রিক পাকিস্তানের উর্দু সংস্কৃতির বিরোধিতায় কলকাতার কালচারাল দাদাঠাকুররা ও তাদের অনুসারী এদেশীয় সেক্যুলাররা হিন্দুয়ানি পৌত্তলিক সংস্কৃতিকে কুফরি জাতীয়তাবাদী বাঙালিয়ানা চেতনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে আমাদের বছরের পর বছর ধরে গেলাচ্ছে। অপরদিকে সংখ্যাগুরু মুসলিমদের ইসলামি আত্মপরিচয়-ধারণকে আরব থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং আমাদেরকেই সাম্প্রদায়িক হিসেবে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। যদিও ওদের এই পৌত্তলিক সভ্যতার শেকড়টাও কিন্তু বহিরাগত আর্যদের সাথেই সরাসরি যুক্ত। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, যাদের মুখে বাঙালিয়ানার বয়ান শোনা যায় বেশি তাদের নাড়ি কিন্তু বাংলাদেশে নয়, কলকাতায় পোঁতা।

তিক্ত সত্য এটাই যে, গাজওয়াতুল হিন্দের আদর্শিক লড়াইটা শুরু হয়েছে বহু আগেই। আমরাই কেবল শত্রুর আগ্রাসন চিনতে পারিনি।

আমি বাঙালি, পরে মুসলিম?

"আমি বাঙালি পরে মুসলিম" কেউ এই কথা অন্তর থেকে বিশ্বাস করলে সে কাফের হয়ে যাবে।

- শাইখ হারুন ইজহার হাফিজাহুল্লাহ

এক যুগান্তকারী ফতোয়া দিয়েছেন আমাদের শাইখুনা। উনার এই ফতোয়ার কারণে আরও একবার আধিপত্যবাদী সেক্যুলার গোষ্ঠীর চাপিয়ে দেওয়া ধর্মীয় পরিচয় বনাম জাতিগত পরিচয়, ধর্মীয় আইন বনাম রাষ্ট্রীয় আইন, ধর্মীয় সংস্কৃতি ও জাতিগত সংস্কৃতির সংঘর্ষ উম্মাহর সামনে স্পষ্ট হলো। এখন যেটা জরুরি সেটা হচ্ছে, ওনার এই ফতোয়ার প্রেক্ষাপট এবং বাস্তবায়ন নিয়ে চুলচেরা স্ট্র্যাটেজিক বিশ্লেষণ, যেন তা অনুসরণের জন্য উম্মতের সুবিধার্থে সরলীকরণ করা সম্ভব হয়। নতুবা এই ফতোয়া কেবল অনলাইনে দ্বীনি মহল পর্যন্তই থেকে যাবে, জনসম্পৃক্ততা পাবে না। আর সেটা হবে আমাদের জন্য বিশাল এক দাওয়াতি ক্ষতি। আর এই সুযোগে প্রতিষ্ঠা পাবে সেক্যুলার হেজেমনি, যার সরাসরি প্রভাব এসে পড়বে আমাদের শাইখুনার উপর।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনই হয়েছে ইসলামি পরিচয়কে পেছনে ফেলে বাঙালি আত্মপরিচয়ের উপর ভিত্তি করে। আর এই আত্মপরিচয়ের ডিসকোর্স যারা আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে স্বাধীনতার পূর্বেই, সেই কলকাতার মনুবাদী, আগ্রাসী, বহিরাগত আর্য সভ্যতার উত্তরসূরি হিন্দুত্ববাদী সেক্যুলার সাংস্কৃতিক জোট চেয়েছিল পাকিস্তানি উর্দু লেবাসে ইসলামি সংস্কৃতির বিপরীতে তাদের সেই ভিনদেশি বৈদিক শিরকি সংস্কৃতিকে বাঙালিয়ানা বলে প্রতিষ্ঠা করতে।

এদেশীয় সেক্যুলার ইসলামবিদ্বেষী গোষ্ঠী যারা বাঙালি আত্মপরিচয়কে সকল কিছুর ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, এরাও সেই কলকাতার গেরুয়া দাদাবাবুদের আদর্শিক অনুসারী। তাই আমাদের মুসলিম উম্মাহবোধকে মিটিয়ে, আমাদের ঈমানী চেতনাকেন্দ্রিক ভালোবাসা ও সহানুভূতির সম্পর্ককে আজ মানবরচিত কাঁটাতারের সীমানায় বিচ্ছিন্ন করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের কুফরি নিজাম যারা আমাদের উপর

চাপিয়ে দিয়েছে তাদের কালো মুখোশ আওয়াম এর সামনে স্পষ্ট করা ব্যতীত একুশে ফেব্রুয়ারি, বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপনকে প্রকাশ্যে প্রশ্নবিদ্ধ করার অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রত্যক্ষ সহায়তায় নিজের উপর সেক্যুলার হিন্দুয়ানি গোষ্ঠীর ‘রাষ্ট্রবিরোধী’, ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী’ হেজেমনি চাপিয়ে নেওয়া। যার চূড়ান্ত এবং সম্ভাব্য ফলাফল হচ্ছে জাতীয়তাবাদের ধর্ম অনুযায়ী মুরতাদের শাস্তি, আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল থেকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড।

আর আমরা যদি সফলভাবে পরিকল্পনা-মাফিক পদ্ধতি অনুসরণ করে ধারাবাহিক দাওয়াহ এবং অ্যাকটিভিজমের মাধ্যমে সেক্যুলার হেজেমনিকে ভেঙে দিতে পারি তবে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার পথে আমরা বিশাল এক মারহালা পূরণ করতে পারব ইনশাআল্লাহ। নতুবা তাদের সমর্থিত ইসলামের সীমানা অতিক্রম করায় ‘ধর্মের অপব্যাখ্যাকারী’ হিসেবে আমাদের সকল ইসলামি অধিকার, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নেতিবাচক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণকেই তাওহীদ প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান বাধা হিসেবে মজুদ করা হবে।

ভুঁইফোঁড়?

"পুরান ঢাকায় সূত্রাপুর, তাঁতীবাজার, নারিন্দা এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মন্দিরগুলোর আশপাশের মুসলিম এলাকা এবং তৎসংলগ্ন মসজিদগুলো নিজেদের সম্পত্তি বলে দাবি করছে গেরুয়া দাদারা। তাদের দাবি অমুক অমুক মসজিদের নিচে তাদের প্রতিমা পাওয়া গেছে।"

চমকে উঠলেন শিরোনাম পড়ে?! খুব বেশি অবাস্তব কিছু কি বললাম?

এই এলাকাগুলো কিন্তু হিন্দুপ্রধান এলাকাই ছিল একসময়। এখন ওরা মুসলিমদের সাথে মিলে মিশে একই এলাকায় থাকে। হিন্দু প্রধান এলাকা ছিল বলে কি মুসলিমদের আত্মপরিচয়ের ডিসকোর্স ভুলে গিয়ে এই এলাকাগুলোর দাবি ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাববেন?

এই এলাকাগুলোতে যে মুসলিমরা থাকেন, তাদের কাছে হিন্দুত্ববাদের আলাপ মানে রাক্ষসপুরীর বানোয়াট গল্প। হিন্দুদের ব্যাপারে তাদের যেরূপ অসাম্প্রদায়িকতা সেটা বোধ করি বাংলার আর কোথাও নেই।

গেরুয়া থাবার কবলে কত নির্মম পরিণতি ঘটবে এই বেখেয়াল উম্মাহর, ভাবতে পারেন?

"একটা একটা হুজুর ধর, ধইরা ধইরা জবাই কর" - এর শুরুটা যদি হয় চট্টগ্রামে, তবে সেটা এসে পূর্ণতা পাবে পুরান ঢাকার শাঁখারী বাজার, সূত্রাপুর, টিকাটুলি, গোপীবাগ, তাঁতীবাজারে এসে।

পরাজিতদের ইতিহাস চুরি ও আধিপত্যবাদ

খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ১৫০০ বছর পূর্বে উত্তর ইউরোপ থেকে যাযাবর আর্যরা এই হিন্দের ভূমিতে এসে তাণ্ডবলীলা চালানোর মাধ্যমে তাদের আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সিন্ধু সভ্যতাকে গুড়িয়ে দেয়। সমগ্র হিন্দ তাদের পদানত হলেও দক্ষিণ ভারত এবং বাংলার দুর্দমনীয় ভূমিসন্তানদের কাছে তারা পরাভূত হয়েছে বারবার। তাদের সেই ব্যর্থ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার গল্পগুলো তাদের বৈদিক সাহিত্যে উঠে এসেছে স্বর্গীয় দেবতা ইন্দ্র কিংবা মহাবীর ভীমের সাথে অসুরদের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে। এখানে আর্যরা হচ্ছে স্বর্গ থেকে নেমে আসা দেবতা, অবতার আর তারা যাদের কাছে বারবার পরাস্ত হয়েছে সেই এদেশের ভূমিসন্তানরা হলো দস্যু, অসুর। খেয়াল করলে দেখবেন, হিন্দুদের সকল দেবতাদের গায়ের বর্ণ ও আকার কিন্তু উপমহাদেশের জনগোষ্ঠীর মতো নয়, বরং ইউরোপীয়দের মতো শুভ্র ও দীর্ঘকায়। অপরদিকে অসুরদের দেহ কাঠামো হুবহু এই অঞ্চলের ভূমিপুত্রদের মতো কৃষ্ণকায়। যুগে যুগে আধিপত্যবাদীরা নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী ইতিহাস রচনা করে নিজেদের দিগ্বিজয়ী রূপ বিশ্বের কাছে প্রতিষ্ঠা করে।

পরবর্তীতে নিজেদের আধিপত্যবাদকে পবিত্র হেয় করার জন্য কালের বিবর্তনে তাদের সেই বৈদিক সাহিত্য যখন ধর্মের মর্যাদা লাভ করল, তাদের ভৃত্য হিসেবে তখন ব্রাহ্মণ-শ্রেণির পথচলা শুরু হলো। প্রতিষ্ঠা পেল কৌলীন্য প্রথা। আর্যদের সেই বিজাতীয় সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৈদিক ধর্ম ততদিনে ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং পরবর্তীতে হিন্দুত্ববাদ হিসেবে এদেশের বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অনুসারী ভূমিপুত্রদের উপর ছড়ি ঘোরানো শুরু করেছে। এই অনাচার গৌরের রাজা শশাঙ্ক এবং সেন রাজাদের সময় এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, জৈন ধর্ম এই অঞ্চল থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা সমতল ছেড়ে পাহাড়ি অঞ্চলে পালিয়ে যায়। খেয়াল করে দেখবেন, আজও সমতল ভূমির চেয়ে পাহাড়ি অঞ্চলেই বৌদ্ধদের বেশি দেখতে পাওয়া যায়। ঠিক এ কারণেই প্রাচীন বাংলাভাষার একমাত্র টিকে যাওয়া লিখিত রূপ চর্যাপদ বাংলা নয় বরং নেপালে পাওয়া গিয়েছিল। চর্যাপদের পুঁথিতে পুঁথিতে উঠে এসেছে সাধারণ বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর উপর প্রাচীন হিন্দুত্ববাদী উচ্চ শ্রেণির ভোগবৃত্তিক মানসিকতা ও জুলুমের

করুণ ইতিহাস। আর ইতিহাসের পট পরিবর্তনে প্রাচীন হিন্দু আর বৌদ্ধদের সেসব সংঘাতের ইতিহাসকে বিকৃত করে নিজেদের আগ্রাসী রূপকে গোপন করে মুসলিম শাসকদের বহিরাগত জুলুমবাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাই তো বিকৃত ইতিহাসে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের দায় দেওয়া হয় ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির উপর।

আজ কলকাতা-কেন্দ্রিক যেসব বাঙালি নিজেদের বাঙালিয়ানা নিয়ে গর্বে উচ্ছ্বসিত সর্বক্ষেত্রে, তারা আবার অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সেই প্রাচীন হিন্দুত্ববাদকেই ফিরিয়ে আনতে চাইছে, যে সময়ে এই অঞ্চলের মানুষের মৌখিক ভাষা মাগধী প্রাকৃত-তে সংস্কৃত বৈদিক গ্রন্থ পড়াকে মহাপাপ হিসেবে বিবেচনা করা হতো এবং তার একমাত্র শাস্তি ছিল রৌরক নরকে পুড়ে পুড়ে অঙ্গার হওয়া। অর্থাৎ আজ যারা বাংলা ভাষা নিয়ে গর্ব প্রকাশ করে সেই বাংলা ভাষার প্রাচীন রূপটিই ছিল তাদের আদর্শিক পূর্বসূরি হিন্দুত্ববাদীদের কাছে নিতান্ত অপবিত্র বিষয়। কেন জানেন তো? ঐ যে এই অঞ্চলের ভূমি সন্তানদের কাছে বারবার তাদের আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে পরাস্ত হওয়া। তাই কলকাতার দাদাবাবু ও তাদের আদর্শিক অনুসারী দেশীয় প্রগতিশীল সেক্যুলার সমাজের মুখে বাঙালিয়ানার গুণকীর্তন স্রেফ দ্বিচারিতা ছাড়া কিছুই না। এরা সেই আগ্রাসী আর্যদের অধুনা উত্তরসূরি।

আগ্রাসী আর্য, গৌরের রাজা শশাঙ্ক এবং সেনরা যেরূপ এ অঞ্চলের সংখ্যাগুরু বৌদ্ধদের উপর হিন্দুত্ববাদকে প্রতিষ্ঠা করেছিল। ঠিকই একইভাবে তাদেরই রুহানি সন্তানরা সহস্র বছর পরে মুসলিম সালতানাত, মুঘল সাম্রাজ্য শেষে ব্রিটিশ কলোনিয়াল আমলের পরে যখন নিজেদের ভূমি বুঝে পেল তখনই নিজেদের জন্য হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি প্রতিবেশী ইসলাম ধর্মের অনুসারী সংখ্যাগুরু মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর হিন্দুত্ববাদী গেরুয়া বয়ান পূর্বের মতো প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয়তাবাদকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করেছিল।

ঠিক এ কারণেই ১৯৪৭-এ ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভক্ত হওয়ার পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা সেক্যুলারদের কাছে গেলেও তারা পূর্ব পাকিস্তান এর মুসলিম জনগোষ্ঠীর

উপর পার্শ্ববর্তী হিন্দু রাষ্ট্রের কালচারাল দাদা ঠাকুরদের প্রভাব দূর করতে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। উর্দু ছিল এই অঞ্চলে ইসলামি বুনিয়াদি শিক্ষা ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটাকে কাজে লাগিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদের ন্যারেটিভ প্রতিষ্ঠা করে কলকাতার গেরুয়া দাদারা। সর্বপ্রথম একজন হিন্দু, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পশ্চিম পাকিস্তানের এই স্ট্র্যাটেজিকাল সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বসে। সরকারি, বেসরকারি অফিসে ইংরেজিকে আজ যেমন মূল্যায়ন করা হয়, ঠিক একইভাবে উর্দুকেও মূল্যায়ন করা হতো যদি উর্দু রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতো এর বেশি কিছু নয়, কারণ খোদ পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ জনগণই উর্দুভাষী ছিল না, কিন্তু তাদের দাপ্তরিক ভাষা ছিল উর্দু। তারা এটাকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন হিসেবে দেখেনি। কিন্তু কলকাতার দাদাদের চাপিয়ে দেওয়া উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ একে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন হিসেবে দেখে এবং ভাষার জন্য আত্মহুতি দেয়। পরবর্তীতে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের কথা বিবেচনা করে কলকাতার গেরুয়া দাদা ও এদেশীয় সেক্যুলার প্রগতিশীলরা কুফরি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যে আত্মাহুতি দেওয়া রফিক, জব্বার, সালামদের 'শহীদ' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে যেন বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার প্রজেক্টের মূলে যে তাদের হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডা আছে সেটা কেউ সেসময় বুঝতে না পারে। আজ এত বছর পর তাওহীদবাদীদের কাছে তাদের সেই ঘৃণ্য চক্রান্ত স্পষ্ট হলেও, তাদের বিরুদ্ধে কথা বলা আজ 'স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি' হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শহীদ মিনার এর ৫টি স্তম্ভের দিকে নজর দিলেও বাঙালি চেতনা চাষাবাদের আড়ালে হিন্দুত্ববাদী আদর্শ লুক্কায়িত সেটা ধরা দেয়। দুর্গা পূজার সময় হিন্দুদের দেবী দুর্গার একপাশে তার পুত্র কার্তিক ও গণেশ এবং অপরপাশে সরস্বতী ও লক্ষ্মীকে যেমন দেখা যায় তেমনি শহীদ মিনার এর ক্ষেত্রেও মাঝের স্তম্ভটি তার দুই পাশের ৪টি স্তম্ভের তুলনায় বড়। প্রগতিশীলরা কিন্তু একে সন্তানদের মাতৃভাষা শিক্ষা দেয়ার সাথে তুলনা করে। অপরদিকে দেবী দুর্গাকেও মাতৃরূপেই দেখা যায়। একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনার-কেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠান কি আপনাদের কাছে হিন্দুয়ানি পূজার সংস্কৃতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হয় না? এটাকে কি বাঙালি চেতনার অংশ বলেই গেলানো হচ্ছে না বছরের পর বছর ধরে? আরেকটা বিষয় খেয়াল করলে দেখবেন, একুশে ফেব্রুয়ারি-কেন্দ্রিক বাংলা একাডেমি বইমেলাতে

কিন্তু প্রগতিশীল সেক্যুলার বাঙালিরা ইসলামি প্রকাশকদের স্টল রাখতে দেয় না খুব একটা। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামকে তারা বাঙালি সংস্কৃতির অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চাচ্ছে না। ঠিক এ কারণেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর 'আমি আগে বাঙালি, পরে মুসলিম' নামক হেজেমনি কায়েম করে ফেলেছে।

সুতরাং, আজ যেসব দেশীয় প্রগতিশীল বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সবার আগে স্থান দেয়, নিশ্চিতভাবেই তারাই গাজওয়াতুল হিন্দের মুজাহিদদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে লিপ্ত হবে যখন হিন্দুস্তানের নাপাক মুশরিকদের সাথে লড়াইটা প্রকাশ্যে আসবে। এদেরকে চিনতে হবে। এদের কালো মুখোশটা খুলে দিতে হবে উম্মাহর কাছে। কারণ মনের জগৎ দখলের লড়াইটা আগে হয়, ময়দানেরটা পরে।

ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়?

শাহবাগী সেক্যুলার পাড়ায় কদিন পর পর বাংলা ভাষায় আষ্টেপৃষ্ঠে থাকা আরবী, ফারসি ও তুর্কি শব্দগুলো নিয়ে জ্বালাপোড়া শুরু হয়। বাংলা একাডেমিও কদিন পর পর বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ইসলামি শব্দের প্রচলিত বানান এর বিপরীতে হাস্যকর বানানরীতি নিয়ে হাজির হয় যা আসলে বাংলা ব্যাকরণ বিরুদ্ধ।

বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারকে আপনি প্রবহমান নদীর সাথে তুলনা করতে পারেন। নদী যেমন তার চলার বাঁকে বাঁকে বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে বিভিন্ন নাম ধারণ করে, তেমনি করে ইতিহাসের নানা বাঁকে বাংলা শব্দভাণ্ডারেও সংস্কৃত, দেশী, বিদেশি বিভিন্ন শব্দ মিশে আছে। এটাই ভাষার সৌন্দর্য। আপনারা হয়তো জানবেন যে, বাংলা ভাষার প্রাচীনরূপকে মাগধী প্রাকৃত আবার গৌড়ীয় প্রাকৃত বলা হয়ে থাকে। চর্যাপদের পুঁথিগুলো বাংলার এই প্রাচীনরূপেই লিখিত হয়েছিল।

চর্যাপদ থেকে দুটি লাইন তুলে ধরছি,
"দিবসেই বহুড়ি কাগ ডরে ভাতা
অতি ভইলে কামরু জাঅ।"

অর্থাৎ, বউটির এতই ভয় যে, দিনের বেলা কাজের ভয়েই চিৎকার করে ওঠে, অথচ রাত হলেই কোথায় যে চলে যায়।
আর বাংলা ভাষা কিন্তু বৃহত্তর পরিসরে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বংশের অন্তর্ভুক্ত। তাই এটা খুবই স্বাভাবিক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাষার বিভিন্ন শব্দের অপভ্রংশ রূপ বাংলা ভাষায় দেখা যায়। যেমন বাংলা 'উসিলা' শব্দটি আরবি 'ওয়াসিলা' থেকে আগত। বাংলা 'ডেকচি' ও 'দোকান' শব্দ দুটি ফারসি 'দীগচে' ও 'দুকান' থেকে আগত, বাংলা 'রিক্সা' শব্দটি জাপানি 'রিকিশা' থেকে আগত, বাংলাতে যা 'আলমারি' ও 'জানালা' পর্তুগিজ ভাষায় তা 'armário', 'janela', বাংলাতে 'হাসপাতাল' আর ইংরেজিতে 'hospital'। এরকম আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যাবে।

প্রশ্ন জাগতে পারে, কেন এমনটা হলো?

খ্রিষ্টপূর্ব আড়াই হাজার পূর্বে এই অঞ্চলে সিন্ধু নদীর অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল সিন্ধু ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতা। জাতিতে তারা ছিল ব্যবসায়ী। বিশ্বের অন্যতম ধনী, উন্নত ও উর্বর ছিল এই অঞ্চল। তাই, উত্তর ইউরোপীয় কৃষিজীবী, যাযাবর আর্যদের নজর পড়ে এই অঞ্চলে। জাতিতে এরা ছিল যোদ্ধা ও বর্বর। ইতিহাসের নানা বাঁকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এরা নিজেদের আগ্রাসন চালিয়েছে কৃষি উপযুক্ত ভূমি দখলের জন্য। এরই ধারাবাহিকতায় এরা যখন এই অঞ্চলে প্রবেশ করে তখন এরা সাথে করে নিয়ে আসে সংস্কৃত শব্দ, যা বর্তমানেও বাংলা ভাষার শব্দসমূহের প্রায় ২৮% দখল করে আছে, যেমন - চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, অগ্রহায়ণ, ভাষা, মনুষ্য, ধর্ম ইত্যাদি। সনাতন ধর্মের বৈদিক সাহিত্যে এই ভাষাই উঠে এসেছে। এই সংস্কৃত শব্দই সাধারণ মানুষের কাছে বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এসময় সাধারণ জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষা কিন্তু সংস্কৃত ছিল না। তারা ব্যবহার করতো বাংলার প্রাচীন রূপ মাগধী প্রাকৃত, যা পূর্বেই বলেছি। ব্যাকরণের ভাষায় এই অঞ্চলে তখন, উৎপত্তি অনুসারে তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দের পাশাপাশি অর্ধতৎসম (সংস্কৃত থেকে কিছুটা বিকৃত), যেমন- জোৎস্না > জোছনা, গৃহিণী > গিন্নি এবং তদ্ভব (প্রাকৃত শব্দের পরিবর্তিত রূপ), যেমন- চর্মকার > চম্মআর > চামার, শব্দ ব্যবহৃত হতো। বাংলা ভাষার অধিকাংশ শব্দই আসলে এই তদ্ভব অর্থাৎ সেই প্রাচীন মাগধী প্রাকৃত এর অপভ্রংশ রূপ।

আবার বাংলায় যখন পারস্য, তুরস্ক থেকে আগত বিভিন্ন মুসলিম সুলতানরা নিজেদের ইসলামি সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন, তখন দাফতরিক ভাষা হিসেবে মূল বাংলা ভাষার শব্দ সমূহের মধ্যে বিভিন্ন আরবি, ফারসি ও তুর্কি শব্দ মিশে গিয়েছে। এরপর বাংলায় বিভিন্ন সময় পর্তুগিজ, ইংরেজ ও ফরাসিরা এসে বাণিজ্য ও নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। সেই সাথে তাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন পর্তুগিজ, ফরাসি ও ইংরেজি শব্দের কিছুটা পরিবর্তিত রূপ তাই আজ বাংলা ভাষার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে। বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারের প্রায় ৮% দখল করে আছে।

সুতরাং, আমরা বুঝতে পারলাম যে, ক্ষমতার মসনদে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতির শাসকরা এই ভূমিতে রাজ করেছে এবং প্রশাসনিকভাবেই বাংলার মূল শব্দভাণ্ডারের সাথে বিভিন্ন ভাষার শব্দ ঢুকে পড়েছে এবং বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারকে এতটা বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তুলেছে। এটা খুবই স্বাভাবিক একটা বিষয়।

কিন্তু, কিছুদিন পরপরই মিডিয়া, সংবাদপত্রের কলামে দেখবেন সেক্যুলার প্রগতিশীলরা তাওহীদবাদী নতুন প্রজন্মের দৈনন্দিন আলাপচারিতায় আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহু খায়রান-সহ বিভিন্ন ইসলামি, আরবি, ফারসি শব্দ ব্যবহার করা নিয়ে চূড়ান্ত বিরক্তি প্রকাশ করে, যেটা তাদের ইসলামবিদ্বেষ-এর পরোক্ষ বহিঃপ্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়। তাদের প্রতিষ্ঠিত কালচারাল ওয়ারে আজ তারা নিজেরাই ধরাশায়ী। সুবহানআল্লাহ! শাহবাগীদের উত্থানের কারণে যখন সবাই ভেবেছিল ইসলাম বুঝি মিটেই যাবে এই ভূমি থেকে, ঠিক তখনই নতুন প্রজন্মের মধ্যে এক আলাদা হাওয়া লাগে দ্বীন ইসলাম অনুসরণের ব্যাপারে। ঠিক এ কারণেই খেয়াল করবেন, একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে আয়োজিত মাসব্যাপী বাংলা একাডেমি আয়োজিত বইমেলাতে ইসলামি প্রকাশনী দেখা যায় নামমাত্র। ইচ্ছাকৃতভাবেই, ইসলাম ও ইসলাম সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্কৃতি যা হাজার বছরের বাঙালির মূল আত্মপরিচয়ের উৎস তা থেকেই বঞ্চিত করতে চায়।

এর পেছনে কারণ কী?

চলুন এবার ফিরে যাই সহস্র বছর পূর্বে ইতিহাসের পাতায়। আর্যরা যখন তাদের বৈদিক সংস্কৃতির মাধ্যমে এই অঞ্চলের ভূমিপুত্রদের উপর তাদের চালানো আগ্রাসনকে ধর্মের বয়ানে উপস্থাপন করে, সে সময় এই অঞ্চলের ভূমিপুত্রদের মুখের ভাষা মাগধী প্রাকৃতে আর্যদের সেই মহাপবিত্র (!?) বৈদিক ধর্মগ্রন্থগুলো অনুবাদ করে পড়া নিয়ে ঘোরতর আপত্তি জানায়, কারণ তাদের দৃষ্টিতে বাংলা ভাষার সেই প্রাচীন রূপ ছিল অপবিত্র। তাই সমাজের সকল উঁচুস্তরে মাগধী প্রাকৃতকে বাদ দিয়ে কেবল মাত্র সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হতো। এটা হচ্ছে অধুনা প্রজন্মের সেক্যুলারদের কালচারাল হেজেমনির প্রাচীন শেকড়। ঠিক একই কাজ করে আজকের সেক্যুলাররাও। শুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ

বলতে তারা আসলে তাদের সেই আদর্শিক পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া সংস্কৃত শব্দের বহুল ব্যবহারকেই বোঝে।

আজকে তারা গান লিখেছে “ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়”, যেখানে তারা উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদের অংশ হিসেবে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে উর্দুকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আর ইসলামের সাথে ন্যূনতম যোগাযোগ রাখা সকলেই জানে, ইসলামের সাথে উর্দুর কত গভীর সম্পর্ক। সব কিছুর মূলে আসলে তাদের সেই ইসলামবিদ্বেষ। অথচ, তাদের সেই আদর্শিক পূর্বসূরি আর্যরাই ছিল “ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়”, এর প্রকৃত উদাহরণ, কারণ আর্যরা নিজেদের সংস্কৃতিকে বাংলার প্রাচীন রূপ মাগধী প্রাকৃতের বিপরীতে এতটাই প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছিল যে, পরবর্তীতে একই আদর্শে দীক্ষিত গৌরের রাজা শশাঙ্ক এবং সেনদের হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনে মাগধী প্রাকৃতের ধারক-বাহকরা এই ভূমি থেকেই উচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল অনেকটা। অর্থাৎ বাংলার প্রাচীনরূপ প্রায় হারিয়েই গিয়েছিল ইতিহাসের পাতা থেকে। পরবর্তীতে, সেই ইরান-তুরান থেকে আগত মুসলিম সুলতানদের সক্রিয় অর্থায়ন ও সহায়তায়ই বাংলা ভাষা আবার নবযৌবন লাভ করে। সকল ঐতিহাসিকগণ এই ব্যাপারে একমত। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ইসলাম ও মুসলিমবিদ্বেষী আজ যারা বাংলা ভাষা নিয়ে এত গর্ব করে, তারা আবার বাংলার এই নবযৌবন লাভের সময়কালটাকে বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ হিসেবে নাম দিয়েছে। অথচ এই মুসলিম শাসনামলেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলির মতো সাহিত্যগুলো রচিত হয়েছিল।

কথায় আছে না, “যারে দেখতে নাহি পারি, তার চলন বাঁকা”?

চেতনার বাতিঘরে কুনজর!

হিন্দুস্তানের বীর মুসলিম বালাকোটের কুরবানির পথ ধরে শামেলী হয়েই হিন্দুকুশের চূড়ায় কালিমার ঝান্ডা গেড়ে দিয়েছে সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। সময়ের ফেরে আজ এই উম্মাহর ঘাড়ে হিন্দুত্ববাদী গেরুয়া থাবা চেপে বসেছে। ওদের গেরুয়া বিষদাঁত ভেঙে দিতে আমাদের আবারও সেই বালাকোটের প্রান্তরেই ফিরে যেতে হবে। আমাদের মধ্যে থেকেই উম্মাহ পাবে তাদের হারিয়ে যাওয়া সাইয়েদ আহমেদ বেরেলভি, শাহ ইসমাইল শহীদ, কাসিম নানুতবি রাহিমাহুল্লাহদের।

পূর্ববর্তী দেওবন্দী আকাবিরগণ বদরের চেতনা ধারণ করে কুফফারদের বিপরীতে নেমেছিলেন বলেই এই উম্মাহ আজও তাদের স্মরণ করে। পরবর্তীরা ওহুদ, বদর, খায়বারের রক্তস্নাত গৌরবের পথে না হেঁটে যে পথ বেছে নিয়েছিলেন, সেই পথ তাদের গত শত বছর ধরে পিঠ বাঁচিয়ে রাখলেও আজ সময় হয়েছে তিক্ত বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার। আজ সময় হয়েছে কাশ্মীরের মুসলিমদের একা ছেড়ে দেওয়ার প্রায়শ্চিত্ত করার।

হায় আফসোস! হে আমাদের রাহবারগণ, আপনারা দ্বীন ও উম্মাহর হেফাজতকে লক্ষ্য বানানোর চেয়ে নিজেদের মারকাজ টিকিয়ে রাখাকে নিজেদের লক্ষ্য বানিয়ে ফেলেছেন। এই উম্মত আপনাদের সুপরিকল্পিত, বাস্তবিক, ঈমানী গায়রতসম্পন্ন দিক-নির্দেশনার অভাবে আল ওয়ালা ওয়াল বারাতের উপর আমল ছেড়ে দিয়েছে, এই উম্মত আজ আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার ভুলে গিয়েছে। আপনাদের শিখিয়ে দেওয়া ফজিলতকেন্দ্রিক আলোচনাকেই আজ দীনের সর্বস্ব ভেবে বসে থাকা উম্মত নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়েছে কুফফারদের বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন। আমাদের মাদ্রাসাগুলো আজ ইরজা সেন্টারে পরিণত হয়েছে যেখানে চলে মাজলুম ফরজের ব্যাপারে উসুলি সব তাহরিফ। কিতাবুল জিহাদের দরস আজ উঠেই গেছে বলা চলে। মুসলিম নামধারী মুরতাদ শাসকের তেলায়নের ট্রেইনিং চলে বড় সব মাদ্রাসাগুলোতে। সমকালীন ফিতনাগুলো সম্পর্কে মিম্বর থেকে কোনো আওয়াজ আসে না। মিম্বরগুলো

গায়রতওয়ালা ইমামের শূন্যতায় কেঁদে ওঠে নীরবে। নবীজীর জমানায় এই মিম্বরগুলো তো সাহাবায়ে কেরামের তরবারি জমা রাখার স্থান ছিল। সময় এসেছে, সেই ১৪০০ বছর আগের সুন্নতকে এই উম্মতের মাঝে আবারও জিন্দা করার। উম্মতের গর্দানগুলো প্রবল আশা নিয়ে আপনাদের দিকে চেয়ে আছে। আপনাদের যুগান্তকারী ফতোয়া এই উম্মতের বুকে শত বছর ধরে চেপে বসা অপমান ও জিল্লতির যে ইতিহাস রচনা করেছে, তাকে নাপাক গেরুয়া রক্তে ধুয়েমুছে দেবে ইনশাআল্লাহ।

বাবরি মসজিদ, জ্ঞানবাপি মসজিদের পর হিন্দুত্ববাদী গেরুয়া সন্ত্রাসীরা আজ উম্মাহর সম্পদ দারুল উলুম দেওবন্দের দিকে লোলুপ দৃষ্টি দিয়েছে। ও মুসলিম জাতি, দেওবন্দ শুধু হানাফি-কওমিদের চেতনার বাতিঘর নয়, দেওবন্দ গোটা উম্মাহর, যেমনি করে জামিয়া আল আজহার, মদীনা ইউনিভার্সিটি এই গোটা উম্মাহর সম্পদ। মাসলাকি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই অঞ্চলের দ্বীন রক্ষার এই বাতিঘরকে একলা ফেলে দেবেন না। দেওবন্দের উপর আঘাত আসা মানে সমগ্র উম্মাহর ইসলামি চেতনার উপর আঘাত আসা। দেওবন্দের উপর বুলডোজার চালানোর হুমকি আমাদের দিকে ধেয়ে আসা গাজওয়াতুল হিন্দের কড়াধ্বনি-কেই স্পষ্ট করে দিলো। আমাদের সকল ওজর, সকল সীমাবদ্ধতাকে চাপিয়ে রেখে এই উম্মতকে নাঙ্গা তরবারির ঝনঝনানি ও তাকবীরের ধ্বনিতে আকাশ বাতাস ভারী করার জন্য প্রস্তুত করতেই হবে।

গাজওয়াতুল হিন্দের সুসংবাদকে হিন্দুত্ববাদীরা আজ নিজেদের অখণ্ড ভারতের জন্য প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছে। ওরা প্রচার করতে চাইছে, এই অঞ্চলের মুসলিমরাই ওদের উপর চেপে বসেছে। অথচ, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ বলেছিল, "হিন্দু আলাদা সংস্কৃতি, মুসলিম আলাদা সংস্কৃতি। দুই সংস্কৃতি কখনো একসাথে থাকতে পারে না। এদের সাথে লড়াই হবে, অবশ্যই হবে। আমরা এক ধর্মযুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছি।" হলফ করে বলতে পারি, হিন্দের পদধ্বনি যখন প্রকাশ্যে বাজবে, তখন মানবতার বয়ানকে সামনে এনে জাতিসংঘ নিয়ন্ত্রিত সারা বিশ্বের কুফফার গোষ্ঠী গেরুয়া সন্ত্রাসীদের পক্ষ নিয়ে মুসলিম রক্তের বৈধতা দিয়ে বসবে, যেমন করে আজ ওরা মিডিয়ার সামনে বলছে, "ইজরায়েলের নাগরিকদের নিজেদের প্রতিরক্ষার অধিকার রয়েছে"। এজন্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

“মানুষের ভেতর মুমিনদের শত্রুতার বেলায় অবশ্যই তুমি ইহুদি ও মুশরিকদের সর্বাধিক কঠোর পাবে।”
(সূরা আল মায়ীদা, আয়াত ৮২)

গাজওয়াতুল হিন্দের যে ফতোয়াকে কেন্দ্র করে আজ গেরুয়া নাপাক রক্তের সন্ত্রাসগুলো দারুল উলুম দেওবন্দকে বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং আতঙ্কবাদী হিসেবে চিহ্নিত করছে সেই বিজয়ের সুসংবাদ তো ১৪০০ বছর ধরেই এই উম্মতের সিনা জুড়ে আছে। দেওবন্দকে মিটিয়ে দিলেই কি ওরা ওদের জালিম শাসকদের গলায় বেড়ি পড়িয়ে আল আকসা পর্যন্ত টেনে-হিঁচড়ে নেওয়া থেকে রক্ষা করতে পারবে? ওরা কি জানে ওদের ঘাড়ের উপর ওরা নিজেরাই মাহদির কালো পতাকার সৈনিকদের চাপিয়ে নিচ্ছে যারা ময়দানে আসেই শহীদ হওয়ার জন্য? ওয়াল্লাহি বিজয়ের সুধা তো মাহদির কাফেলার জন্যই। আমরাই সেই কাফেলার অংশ ইনশাআল্লাহ। সুতরাং, আমাদের দুশ্চিন্তার কিছু নেই। পুরো অখণ্ড ভারতজুড়ে শিরকি রামরাজ্য নয়, ইমারতে ইসলামিয়া ওয়াল হিন্দ প্রতিষ্ঠা করব আমরা ইনশাআল্লাহ।

আমার জমিন, আমার দ্বীন

আজ বাংলার মুসলিম উম্মাহ ভাগ্য নির্ধারণী এক চরম সংকটময় মুহূর্তে এসে দাঁড়িয়েছে। এই মুহূর্তের একটা সিদ্ধান্ত এই উম্মতকে ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই করে দেবে। হয় তারা বাংলার জমিনে হিন্দুত্ববাদী গেরুয়া আধিপত্যকে চূড়ান্ত মোকাবেলার পথে সাফল্যমণ্ডিত ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে পারবে, নাহয় তারা জিল্লতি ও অপদস্থতার এক কলিযুগে প্রবেশ করবে, যেখান থেকে এক সমুদ্র পরিমাণ কুরবানি ব্যতীত এই উম্মতের ভাগ্যাকাশে সুবহে সাদিকের আবির দেখা যাবে না।

হিন্দু থেকে মুসলিম হওয়া নওমুসলিম ভাই-বোনদের ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর দায়িত্ববোধ এর চূড়ান্ত অবহেলা তাদের আগ্রাসী হিন্দুত্ববাদের কারণে কঠিন ঈমানী পরীক্ষায় ঠেলে দেয়। পার্শ্ববর্তী মুসলিম রক্তখেকো গেরুয়া সাম্রাজ্য থেকে 'ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপ' এর বিষাক্ত থাবা শাহজালালের এই ভূমিতে এসে পড়েছে। গায়রতের পরীক্ষায় আমরা লজ্জাজনক অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের মা-বোনদের পবিত্র গর্ভে হিন্দুয়ানি নাপাক বীর্য আজ স্থান পেয়েছে। আমাদের বোনদেরকে ষড়যন্ত্র করে, প্রয়োজনে জাদুর আশ্রয় নিয়ে হলেও নিজেদের বশে নিয়ে পরবর্তীতে মূত্রখোর রাষ্ট্রে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা হচ্ছে।

শত শত স্ক্রিনশট আজ ক্রমেই অগ্রসরমান গেরুয়া থাবার কথা জানান দিচ্ছে। কিন্তু কোথায় আমাদের এই জমানার মুহম্মদ বিন কাসিমরা? মুজাহিদ সন্তান জন্ম দেয়া রত্নগর্ভা মায়েরা আজ কোথায়? আমাদের ইসলাহী মজলিসগুলো থেকে উম্মতের এই করুণ পরিস্থিতিতে ঘুরে দাঁড়ানোর মতো জিহাদী জজবা ধারণের আলোচনা আজ হচ্ছে না কেন? জিহাদের ময়দানের চেয়ে উত্তম আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্র আর কোথায় আছে? কিতাবুল ফিতানে গাজওয়াতুল হিন্দের হাদীসগুলো সেলিব্রেটি আলেম ও লেখকরা উম্মতের কাছে কেন পেশ করছেন না? কেন তাদেরকে বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে না? কেন তাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় জানমাল বিলিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বোত্তম উম্মত হওয়ার পথ বাতলে দেওয়া হচ্ছে না?

আর কত সময় পার হলে আমরা বুঝতে পারব, হিন্দুত্ববাদের বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন ক্রমেই আজ রক্তক্ষয়ী এক অনিবার্য সংঘাতের দিকে বাঁক নিচ্ছে? বাবরি মসজিদের হন্তারকরা জ্ঞানবাপি মসজিদের দিকে নজর দিয়েছে। মাদ্রাসাগুলোতে 'রামচরিত'-এর পঠন বাধ্যতামূলক করেছে। গরুর মাংস ফ্রিজে থাকার অপরাধে মুসলিম হত্যাকে স্বাভাবিক বানিয়ে ফেলেছে। গুজরাট আর কাশ্মীরের রক্তবন্যা আমাদের সামনে দৃশ্যমান, বছরের পর বছর ধরে। আমাদের শিশুদের মনকে অবচেতনে হিন্দুত্ববাদী চেতনায় দীক্ষিত করার জন্য ইতিহাস বিকৃত করে মুসলিমদের আত্মপরিচয়ের ডিসকোর্সকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে এই ভূমিতে। রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, সামরিক সকল উচ্চপদস্থ ক্ষেত্রে আজ গেরুয়া অশুভ শক্তির পদচারণা। সীমান্তে পাখির মতো বাঙালি মুসলিমদের নিধন করার কর্মযজ্ঞ চলছে বছরের পর বছর ধরে। ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়ার চূড়ান্ত নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য পশ্চিমা তাগুত গোষ্ঠীর সক্রিয় সমর্থন আজ আমাদের সামনে স্পষ্ট। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সেইন্ট মার্টিনকে ক্রমেই আমরা হারিয়ে ফেলছি নিজেদের মানচিত্র থেকে।

ওয়াল্লাহি এই জমিন আল্লাহর। এই জমিন আল্লাহর প্রতিনিধিদের, যারা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে তাঁর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য কোনো আগ্রাসী শক্তির চোখে চোখ রেখে কথা বলতে এবং পাল্টা আঘাত হানতে পিছপা হয় না। এই উম্মাহ তো সেই জাতি যাদের মধ্যে ছিলেন হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, খালিদ বিন ওয়ালিদ, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, মুহাম্মদ আল ফাতিহ, মুহাম্মদ বিন কাসিম, সাইফুদ্দিন কুতুজ, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী, রোকনুদ্দিন বাইবার্স, শাইখুল মুজাহিদীন, আমিরুল মুজাহিদীন, ইমাম শামিল, আমির খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাহিমাহুমুল্লাহরা। এই উম্মত ইসলাম এর জন্য মারতে ও মরতে জানে। এই উম্মতের নেতা রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের পূর্বে পাঠিয়েছেন তরবারিসহ কালিমাতুত তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য। মক্কার মুশরিকদের হাজারো কটূক্তি যার ইস্পাত কঠিন বিজয়ী মানসিকতায় চির ধরাতে পারেনি, সেই নবীর প্রিয় উম্মত আমরা। আমরা কীভাবে 'জঙ্গি', 'উগ্রবাদী', 'উসকানিদাতা', 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' ট্যাগের ভয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহকে ভুলে যেতে পারি। এই বাংলাসহ সমগ্র ভারতের বুকে অখণ্ড ইমারতে ইসলামিয়া ওয়াল হিন্দ প্রতিষ্ঠার কাফেলায় প্রথম

সারির সৈনিক তো আমরাই, যাদের কুরবানির গল্প তাদের উত্তরসূরিদের গেরুয়া আধিপত্যবাদের নোংরা গল্প মুছে দিতে উৎসাহ দেবে ইনশাআল্লাহ। পরাজিত মানসিকতা এই উম্মতের রক্তে নেই। আমাদের সকল অবহেলা, ওজর ও সীমাবদ্ধতার গল্পগুলো মুছে দিতে হবে আল্লাহর জমিনে সমস্বরে আল্লাহু আকবার ধ্বনির মাধ্যমে। এই জমিনে 'জয় শ্রী রাম' ধ্বনির অশুভ হুংকার শোনামাত্রই সেই কণ্ঠনালি ছিঁড়ে দিয়ে হিন্দুত্ববাদী নাপাক মস্তিষ্কে মুসলিমদের ঈমানী গায়রতের আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

দ্বীনি ভাইদের দুটো নাসিহাহ করছি –

১. আমাদের মতভিন্নতাগুলো যেন মতবিরোধে পরিণত না হয়।

২. মূল শত্রুকে বাদ দিয়ে আমরা যেন পার্শ্বীয় বিবাদে জড়িয়ে না পড়ি।

এখন আমাদের কাজ হচ্ছে —

১. হিন্দুত্ববাদকে মূল শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ ভূমিতে ইসলাম ও মুসলিম জাতির ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা।

২. কলকাতায় নাড়ি পোতা আধিপত্যবাদী প্রগতিশীল সেক্যুলার গোষ্ঠীর অসাম্প্রদায়িক মুখোশটা খুলে দিয়ে উম্মতের সামনে তাদের ইসলামবিদ্বেষী গেরুয়া চেহারাটা উন্মোচন করা।

৩। ধারাবাহিক, পরিকল্পনা-মাফিক দাওয়াতি কাজ ও অনলাইন অ্যাক্টিভিজমের মাধ্যমে বাঙালিয়ানা চর্চার বয়ানে হিন্দুত্ববাদী সংস্কৃতি ও আদর্শের হেজেমনি ভেঙে দিতে হবে।

৪। আমাদের সকল স্ট্র্যাটেজিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। উম্মাহকে নিরবচ্ছিন্ন দাওয়াহর এর মাধ্যমে এদাদ ও মাজলুম ফরজের বরকতময় পথে পদচারণার উৎসাহ দিতে হবে।

দাদার উপরেও দাদা থাকে

পাশের দেশের কালচারাল পুরুত ঠাকুরেরা আমাদের ঘাড়ে ভাষা ও জাতিগত পরিচয়কেন্দ্রিক উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদ চাপিয়ে দিলেও নিজেরা কিন্তু ধর্মকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদকে পুঁজি করেই বিশাল এক রাষ্ট্র পরিচালনা করছে বলেই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। কিন্তু সঠিক কথা হচ্ছে, হিন্দুত্ববাদ হিন্দু ধর্ম থেকে উৎসারিত কোনো আদর্শ নয়, বরং হাজার বছরের পথ চলায় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের আচার-সংস্কৃতি কেন্দ্রিক আদর্শ। যেমন, গরুর মাংস খাওয়া যাবে না, এটা আপনি হিন্দুদের ধর্মীয় শাস্ত্রে খুঁজে না পেলেও হিন্দুত্ববাদী আদর্শের মধ্যে খুঁজে পাবেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে জাতীয়তাবাদী চেতনা ওরা আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে ইসলামি আদর্শের বিপরীতে নিজেদের শিরকি গেরুয়া প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য, সেই একই জাতীয়তাবাদ ওরা নিজেদের ঘাড়ে কেন চাপিয়ে রেখেছে?

সহজ কথা হচ্ছে, এই উম্মত খিলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে যেমন ঐক্যবদ্ধ ছিল, তেমনি আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রগুলোতে জাতীয়তাবাদ হচ্ছে সেই অস্ত্র, যার সামনে কাঁটাতারের মানচিত্রে আবদ্ধ ভূমির সকল জনগণ আনুগত্য স্বীকার করে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় বৃহত্তর স্বার্থে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ যেমন এই ভূমির মুসলিমদের ইমারত-খিলাফত প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে অবচেতনে ঐক্যবদ্ধ করেছে তিলে তিলে, তেমনি ১৯০ বছরের ব্রিটিশদের গোলামি গেরুয়া পুরুত ঠাকুরদের শিখিয়ে দিয়েছে কীভাবে বিশ্ব রাজনীতিতে বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসনের বিপরীতে নিজ জাতিসত্তাকে টিকিয়ে রাখতে হয়।

একটু খুলেই বলি, এই হিন্দুত্ববাদী আদর্শের বয়ানেই বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও ভারত একক মানচিত্র নিয়ে টিকে আছে। এই আদর্শকে ধারণ করেই তৎকালীন কংগ্রেস সিকিমকে অধিগ্রহণ করেছিল অযথা রক্তপাত ছাড়াই। কিন্তু কংগ্রেস এর হিন্দুত্ববাদী চেহারা কয়জন জানে? মুসলিম আগ্রাসনের কারণেই বিজেপির হিন্দুত্ববাদী চেহারাটা প্রকাশ পেয়েছে। হাজার বছর পরে এসে কেন হিন্দুত্ববাদের উগ্র রূপটা বিজেপি, আরএসএস নিজের জনগণের উপর চাপিয়ে দিল? দীর্ঘসময় ধরে তো হিন্দু-মুসলিম সহাবস্থানেই ছিল। এদের এই আগ্রাসী চেহারা জানা থাকলে শাইখুল

ইসলাম হোসাইন আহমদ মাদানী রাহিমাহুল্লাহ উনার রাজনৈতিক দর্শনকে ঘুরিয়ে হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রাহিমাহুল্লাহদের সাথেই ঐক্য করতেন বলে মনে করি।

উত্তরটা দিয়ে দিচ্ছি, পুরুত ঠাকুরেরা খুব ভালো করেই জানে, দাদার উপরেও দাদা থাকে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পেছনে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু বছরের নিশ্ছিদ্র প্ল্যান ও তার সফল বাস্তবায়ন ছিল (তারা তো আর শুধু শুধু আফগান সোভিয়েত যুদ্ধে আফগান মুজাহিদীনদের রসদ সরবরাহ করেনি), ঠিক তেমনি সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত এককেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার চূড়ান্ত পতন ঘটাতে সমাজতান্ত্রিক চীন একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করে ফেলেছে। হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে এসে চীনকে নিজের পঞ্চম প্রজন্মের ফাইটার জেট, কিংবা নিউক্লিয়ার সাবমেরিন যুক্ত বিশাল নেভাল ফ্লিটের ভয় দেখানো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব না স্থানীয় কোনো ভিন্ন মীরজাফর রাষ্ট্রের সহায়তা ছাড়া। এক্ষেত্রে তাইওয়ান সাহায্য করলেও, ভারত সেই সাহায্য করবে না সহজে। কারণ ভারত খুব ভালো করেই জানে আমেরিকা যার বন্ধু হয়, তার শত্রু লাগে না। আর আফগান-আমেরিকার দীর্ঘ যুদ্ধে প্রতিবেশী প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের আর্থসামাজিক কাঠামো কীভাবে ভঙ্গুর হয়ে গিয়েছে শুধু আমেরিকাকে সাহায্য করার কারণে, তা ভারতের চেয়ে বেশি ভালো আর কেউ পর্যবেক্ষণ করেনি। একই পরিণতি নিজের ঘাড়েও যেন না এসে পড়ে সেজন্যই উগ্র হিন্দুত্ববাদী আদর্শের ভিত্তিতে যেকোনো মূল্যে নিজ ভূখণ্ডের অখণ্ডতা ধরে রাখতে মরিয়া তারা। এমনিতেই সেভেন সিস্টার্সে চীনের সহায়তায় নিয়মিত বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যক্রম সামাল দিতে ভারত নাজেহাল হয়ে পড়ছে।

তাই বাস্তবতা হচ্ছে, বিজেপির উগ্র হিন্দুত্ববাদী আদর্শের ভিত্তিতেই যেকোনো বহিঃশত্রু এবং বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্রীড়নক হওয়া থেকে ভারতের ভূখণ্ডগত অবিচ্ছিন্নতা টিকে থাকবে এবং জনগণ ঐক্যবদ্ধ থাকবে। যেখানে একটা রাষ্ট্রের মধ্যেই যখন বিভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতির জনগণ, তখন তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে একটা কমন আশা, আকাঙ্ক্ষা

তাদের সামনে রাখতে হয়। আর অখণ্ড ভারত, কথিত রামরাজ্য হচ্ছে সেই মুলা, যেটা বিজেপি ঝুলিয়ে রেখেছে জনগণের সামনে। বিপরীতে একই আদর্শের বুদ্ধিবৃত্তিক রূপটাই চর্চা করে কংগ্রেস। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ হাসিল করতে কংগ্রেস, বিজেপির চেয়ে বেশি উপযোগী। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, ভারতের
আগামীর নির্বাচন এই উপমহাদেশের ভূ-রাজনীতিতে হিসাবনিকাশ সব উলোট-পালোট করে দেবে এবং গাজওয়াতুল হিন্দের চূড়ান্ত ডিসকোর্স নির্ধারণ করে দেবে। কংগ্রেস সেখানে মসনদ দখলের লড়াইয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগী মিত্র হিসেবে উপনীত হতেই পারে।

‘অখণ্ড ভারত’ একটি সাম্রাজ্যবাদী এজেন্ডা

প্রিয়া সাহার কথা মনে আছে আপনাদের? এই মুশরিক মহিলা নিজেই নিজের ঘরে আগুন দিয়ে বাস্তুভিটা পুড়িয়ে ছাই করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে গিয়ে মায়াকান্না কেঁদে এদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের মানবেতর জীবনের এক বানোয়াট করুন অবস্থা তুলে ধরেছিল। তার এই ভণ্ডামি পরবর্তীতে তার গ্রামের প্রতিবেশীরা মিডিয়ার সামনে তুলে ধরে।

হিন্দুদের দুর্গাপূজার সময় প্রায়ই ওদের মণ্ডপে প্রতিমা ভাঙচুরের চিত্র মিডিয়াতে উঠে আসে। আর সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর সাম্প্রদায়িক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সারা বছরজুড়ে হিন্দুদের টাইমলাইনে ‘সংখ্যালঘু’ বলে বলে মায়াকান্নার রোল পড়ে যায়। পরে যখন চিরুনি অভিযান চালানো হয়, তখন ধরা পড়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিন্দুরা নিজেরাই নিজেদের প্রতিমাগুলো ভাঙচুর করে একটা উত্তেজক পরিবেশ তৈরি করে ফেলে।

বছরের পর বছর ধরে কেন এই পরিস্থিতিগুলো সৃষ্টি হচ্ছে?

সত্যি কথা হচ্ছে, পার্শ্ববর্তী হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার ও আরএসএস এর প্রত্যক্ষ নির্দেশে এদেশীয় সংখ্যালঘু হিন্দুরা অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠায়, ভারতীয় আগ্রাসী গেরুয়া নাপাক বাহিনীর মাধ্যমে এই অঞ্চলে সংখ্যাগুরু মুসলিমদের উপর সশস্ত্র আগ্রাসনের রাস্তা করে দেওয়ার জন্য নিজেদের ইচ্ছাকৃত ক্ষতিসাধন করে মুসলিমদের উসকানি দিয়ে যাচ্ছে পরিকল্পিতভাবে। খেয়াল করলে দেখবেন, নিজেদের মুখোশ ঢাকার জন্য, নিজেদের অপকর্মের বিরুদ্ধে সকল প্রতিবাদ কর্মসূচি মুছে দেওয়ার জন্য দেশের সকল জরুরি প্রশাসনিক, জনস্বাস্থ্য, উন্নয়নমূলক, সামরিক, নিরাপত্তা বিষয়ক খাতে হিন্দুত্ববাদীদের পেইড এজেন্টদের জয় জয়কার। এরাই কিন্তু আবার বলে বেড়ায়, এরা নাকি সংখ্যালঘু হিসেবে অধিকার বঞ্চিত। আবার পদ্মা সেতুসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা ও অবকাঠামোগত সব স্থাপনা নির্মাণ প্রকল্পে প্রায়ই বিভিন্ন ছদ্মবেশে ভারতীয় গোয়েন্দা ধরা পড়ে। মিডিয়া সাহারা কিন্তু এই ব্যাপারে নিরব থাকে ঠিকই।

হিন্দুত্ববাদী রাজা গণেশের কথা জানা আছে আপনাদের? বাংলার মুসলিম সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ এর প্রধান উজির ছিল সে। আমাদের মুসলিম সালতানাতেরই উচ্ছিষ্ট খেয়ে বড় হয়ে, এই সালতানাতকেই মুছে দিতে এসে একের পর এক সুলতানদের গুপ্তহত্যা করেছিল পরিকল্পিতভাবে। ইতিহাস থেকে আমরা কমই শিখি। নাহলে নিজেদের রাষ্ট্রের সকল গুরুত্বপূর্ণ খাতে হিন্দুদের অবাধ, শক্তিশালী বিচরণের পরও আমরা ঠিকই জোর গলায় দাবি করি কীভাবে যে, এই জমিন শাহজালালের জমিন, এই জমিনের ৯০ পার্সেন্ট মানুষ মুসলিম? তিক্ত কথা হচ্ছে, আমরা শাহজালাল রাহিমাহুল্লাহকে স্মরণ করি ঠিকই, কিন্তু উনার আদর্শ থেকে বহু দূরে সরে গেছি আজ। আমাদেরকে গিলে খাবার জন্য দীর্ঘকাল ধরে ওদের গভীর চক্রান্ত এবং সেটার বাস্তবায়ন চলছে। অথচ আমরা শীতনিদ্রায় বেঁহুশ।

গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলি, মাথায় গেঁথে নিন। ভারত মানেই মোদী প্রশাসন নয়। ভারতের দক্ষিণ অংশের একটা বিরাট অঞ্চলে হিন্দুত্ববাদের আধিপত্য নেই। এই দক্ষিণাংশে হিন্দুত্ববাদীদের আদর্শিক পূর্বসূরি বহিরাগত আর্যরাও কখনো রাজ করতে পারেনি। মোদী প্রশাসন চায় এই অঞ্চলে সংখ্যালঘু হিন্দুদের কাজে লাগিয়ে ভিক্টিম গেম খেলে পশ্চিমা বহির্বিশ্বের প্রকাশ্য সম্মতিতে এই ভূমির মুসলিমদের উপর নিজেদের প্রতিরক্ষার ওজরে পালটা রক্তক্ষয়ী আগ্রাসন চালানোর রাস্তা তৈরি করতে। ভারতের সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে আজ মুসলিম রক্তের প্রতি যে লালসা তৈরি হয়েছে সেটার ছাপ দূষিত বাতাসের উপর ভর করে এই অঞ্চলেও যে ছড়িয়ে পড়ছে সেটারই বাস্তব রূপ হচ্ছে 'ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপ' প্রজেক্ট এবং প্রকাশ্যে জয় শ্রী রাম বলে হর্ষধ্বনির সাথে সাথে 'একটা একটা মোল্লা ধর, ধইরা ধইরা জবাই কর' স্লোগান।

অপরদিকে, আমেরিকা চায় এই অঞ্চলে যেকোনো মূল্যে একটা বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগুক এবং সেই সমস্যা নিরসনে নিজেদের শান্তিকামী ক্রুসেডার বাহিনী পাঠিয়ে ক্রম বর্ধমান আধিপত্যবাদী চীনকে শায়েস্তা করতে। এজন্য দেখবেন যে, মায়ানমারে আরাকানে চূড়ান্ত রূপে মানবতার বিপর্যয় ঘটার পরও শান্তিকামী আমেরিকা

নিয়ন্ত্রিত পশ্চিমারা নিশ্চুপ। আরাকানের মুসলিম রক্তের বন্যাও জাতিসংঘের শান্তিবাহিনী প্রেরণের কারণ হয় না। বরং আফ্রিকার মুজাহিদ ভাইদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়।

চীনের ব্যাপারে ভারত এবং আমেরিকার স্বার্থ একই বিন্দুতে মিলে যায়। কারণ লাদাখ সীমান্তে চীনের বিপরীতে ভারতের চূড়ান্ত দুর্বলতা ধরা পড়েছে। চীন শায়েস্তা হলে, এশিয়াতে ভারতের প্রভাবও বৃদ্ধি পাবে। আবার অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেও এশিয়ার বুকে নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠার পথে ভারত এগিয়ে যাবে বহুদূর। ব্রিটিশদের থেকে ১৯০ বছরের দীক্ষা নিয়ে ভারত আসলে নব্য সাম্রাজ্যবাদী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে। তবে আমেরিকার ইচ্ছানুযায়ী পথে চললে, নিজ দেশের সার্বভৌমত্ব, স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হবে, জনগণ প্রশাসনের বিরুদ্ধে চলে যাবে। আফগান-মার্কিন যুদ্ধে পাক ভূমি ব্যবহার করেই যুদ্ধ করেছিল আমেরিকা। আজ পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় অস্থিতিশীলতার পেছনে এটা একটা বড় কারণ। আমেরিকা যার বন্ধু হয় তার শত্রুর প্রয়োজন হয় না এটা মোদী সরকার জানে। তাই তারা ঝুঁকি নিতে চাচ্ছে না। বরং নিজেদের লক্ষ্য বাস্তবায়নে ধর্মীয় বয়ানকে কাজে লাগিয়ে ধর্মবিরুদ্ধ উগ্র হিন্দুত্ববাদের বাম্পার ফলন ঘটিয়েছে জনগণের মধ্যে। এ কারণেই বলেছিলাম, ভারতের পরবর্তী নির্বাচন এর ফলাফল গাজওয়াতুল হিন্দের ডিসকোর্স নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে গেরুয়া সৈনিকদের জন্য।

ধর্মযুদ্ধের দামামা বাজে

ভারতের উত্তর প্রদেশে আদানি গ্রুপ ৫০০ হেক্টর জমির উপর তৈরি করেছে দক্ষিণ এশিয়ার সর্ব বৃহৎ অস্ত্র প্রস্তুতকারক ফ্যাক্টরি, যা অনলাইনে উদ্বোধন করেছে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। চিনতে পারছেন তো তাকে? জি, এই সেই ব্যক্তি যে ভরা সমাবেশে ব্যক্ত করেছিল, মুসলিম আর হিন্দু সংস্কৃতি কখনোই এক হতে পারে না; তাই তারা এক ধর্মযুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আর জানেন তো, দারুল উলুম দেওবন্দও কিন্তু উত্তর প্রদেশেই অবস্থিত? বুঝতে পারছেন কিছু?

আপনার-আমার শত্রু অতি পরিকল্পিত উপায়ে নিজেকে প্রস্তুত করছে এক রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক লড়াইয়ের জন্য। আর আমাদের জজবা শুধু নওমুসলিম বোনের মামলা এবং ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপ-কেন্দ্রিক ভাইরাল হওয়া কিছু স্ক্রিনশট পর্যন্তই। না মসজিদের মিম্বর থেকে এই ব্যাপারে উম্মাতকে সচেতন করা হচ্ছে, না সেলিব্রিটি লেখক ও অনলাইনে দায়ী ভাইয়েরা এই ব্যাপারে নিয়মিত উম্মাতকে সজাগ করছে। আমাদের জজবা ইস্যুকেন্দ্রিক। বিপরীতে, আমাদের শত্রু কতটা ফোকাসড।

কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, ২০ জন মুমিন ২০০ জন কাফের এবং ১০০ জন মুমিন ১০০০ জন কাফেরের বিপরীতে যথেষ্ট। ইতিহাসেও এই আয়াতের বারবার পুনরাবৃত্তি দেখেছি আমরা। খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে মুতার যুদ্ধের কথা স্মরণ করলেই ব্যাপারটা বুঝে আসবে। কোথায় গেল উম্মতের সেই হিম্মতওয়ালা মুমিন মুজাহিদীন, যাদের শত্রুর বুকে কাঁপন ধরানোর জন্য তাদের 'আল্লাহু আকবার' এর ধ্বনিই যথেষ্ট ছিল? আবার হাদীসে তাকালে দেখা যায়, মাহদির কাফেলা শুধু তাকবীরের ধ্বনিতে কনস্টান্টিনপল এর দুর্গের প্রাচীর ধসিয়ে ফেলবে। আমরাও স্বপ্ন দেখি সেই মাহদির কাফেলায় থাকার জন্য। কিন্তু, আমরা কি নিজেদের সেরূপ যোগ্য করে গড়ে তুলতে পেরেছি আদৌ? শত্রুর অন্তরে কাঁপন ধরানোর সাধ্যমতো প্রস্তুতি কোথায় আমাদের? আল্লাহর কুরআনে কি নিজেদের ঘোড়াসমূহ প্রস্তুত রাখার মধ্য দিয়ে ইদাদ গ্রহণের কথা আসেনি?

দেওবন্দের একটি ইটেরও কিছু হলে নাকি হিন্দুত্ববাদীদের আর রক্ষে থাকবে না, আমার জানা নেই, যারা এরূপ মুখরোচক হুংকার দিচ্ছে, তারা নিজেরাও নিজেদের কথার অর্থ জানে কি না...

যোগী আদিত্যনাথের উত্তর প্রদেশে সকল ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের আইনি নোটিশ জারি করা হয়েছে। কয়েকমাস আগে গাজওয়াতুল হিন্দ সংক্রান্ত একটি পুরাতন ফতোয়াকে সামনে এনে কওমি ঘরানার চেতনার বাতিঘর, বিখ্যাত দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা বন্ধের যেই আগ্রাসী আহ্বান আরএসএস ও বিজেপির গেরুয়া সন্ত্রাসীদের মুখে শোনা গিয়েছিল তারই বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে এবার।

মাসখানেক আগে ইসকনের পেইড এজেন্ট নওফেল গংদের কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা কাঠামোর ব্যাপারে যে কু-নজর পড়েছিল সেটাও ধরে নিন বাংলার জমিনে ভারতের উত্তর প্রদেশের ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের এই ঘটনার প্রথম ফেইজ।

আবারও বলি, দু-দিন পর পর ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপ ইস্যুতে মুমিনদের জজবাতি আচরণ তথা অ্যাকশন, পাল্টা রিয়াকশন বহু বছরের এই পরিকল্পিত হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের দামামাকে মোকাবেলা করার জন্য জন্য কোনোমতেই যথেষ্ট নয়।

এক ঘোর অমানিশা এই ভূমির মুসলিম উম্মাহর জন্য অপেক্ষমাণ। শাহাদাতের দুয়ারগুলো যেমন খুলে গেছে, তেমনি নিফাকের চাষাবাদও বেড়ে গেছে বহুগুণে।

গরু খাওয়া মুসলিম

শুধু আরবি ওজীফা বই পাওয়ার কারণে এক রিক্সাওয়ালাকে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে অপমান, অপদস্থ ও গণপিটুনি দিয়েছে এদেশের আলো বাতাসে বেড়ে ওঠা সংখ্যালঘু মোদীর সৈন্যরা। হাটহাজারী, পটিয়া, মেখল, যাত্রাবাড়ী, রহমানিয়া, মারকাজুদ দাওয়াহর মতো মাদ্রাসাগুলো যেই জমিনের বুকে দাঁড়িয়ে, সেই জমিনে দেশ বিভাগের পর রামসেনাদের ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন প্রকাশ্য সন্ত্রাসী কার্যকলাপ নিকট অতীতে আপনাদের নজরে এসেছে কখনো?

দিল্লির মন জোগাতে আম্মাজানের প্রশাসন ক্যাম্পাসগুলোতে ইফতার মাহফিলের আয়োজন নিষিদ্ধ করলেও, ৯০% মুসলিমের এই জমিনে দেশজুড়ে ঠিকই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে হিন্দুদের সরস্বতী পূজার আয়োজন হয়েছে সাড়ম্বরের সাথেই। অসাম্প্রদায়িকতার দাওয়াত ফেরি করে বেড়ানো আধিপত্যবাদীরা আজ ইসলামকে হটিয়ে দিয়ে মুসলিম উম্মাহর ঘাড়ে শিরকি এক জীবনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে যেকোনো মূল্যে।

নতুবা, দেশ জুড়ে ভার্সিটির শিক্ষার্থীরা যখন গণ-ইফতার মাহফিলের আয়োজন করল, এতেও সেক্যুলাঙ্গাররা নাকি উগ্রবাদ-জঙ্গিবাদ এর গন্ধ পায়। ঢাকা ভার্সিটিতে কুরআন তিলাওয়াতের আসরকে কেন্দ্র করে প্রগতিশীল পাড়ায় আজ মরা কান্নার রোল পড়ে গেছে। 'প্রোডাক্টিভ রমজান'- কেন্দ্রিক আয়োজনের জন্য মোদীর রামসেনাদের এদেশীয় আজ্ঞাবহ পেটোয়া লাঠিয়াল বাহিনীর সন্ত্রাসী আগ্রাসন থেকে রেহাই পায়নি ঢাকা ভার্সিটির রোজাদার শিক্ষার্থীরাও। বুঝতে পারছেন, কুরআনের আসর, ইফতার মাহফিলকেও আর সহ্য করতে পারছে না হিন্দুত্ববাদীদের এদেশীয় দোসররা?

টেন্ডারবাজির মাধ্যমে কৃত্রিম মূল্যস্ফীতি সৃষ্টির মাধ্যমে ইফতার ও সেহরিতে বাঙালি মুসলিমদের খেজুর খাওয়ার সুন্নাহ আদায় করা থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে এই রমজানে, যেখানে সারা বিশ্বে রমজান মাসে সকল পণ্যের মূল্য কমিয়ে আনা হয় ব্যবসায়িক স্বার্থকে পেছনে রেখে।

এই অঞ্চলের মুসলিম সারা বিশ্বের মুসলিমদের কাছেই ‘গরু খাওয়া মুসলিম’ হিসেবে পরিচিত। কুরবানির পশু হিসেবে গরুকে প্রাধান্য দেওয়া এই অঞ্চলের মুসলিমদের আত্মপরিচয়ের অংশ। হিন্দুত্ববাদী রাজা গৌড় গোবিন্দের রাজ্যে বুরহান নিজের ছেলের আকিকায় গরু কুরবানি করেছিল বলে, তার সেই আদরের শিশু সন্তানটিকে হত্যা করে ফেলা হয়। এরই জের ধরে সিলেটের বুকে সর্বপ্রথম ইয়েমেন থেকে হিজরত করা সুফি সম্রাট হযরত শাহজালাল রাহিমাহুল্লাহ কালিমার পতাকা বুলন্দ করে দেন। হিন্দুত্ববাদী রাজা বল্লাল সেনের রাজ্যে গরু কুরবানিকে কেন্দ্র করে মুন্সীগঞ্জে বাবা আদম শহিদ রাহিমাহুল্লাহকে উনার কাফেলাসহ সমূলে শহিদ করে দেওয়া হয়। আজও মোদীর ভারতে মুসলিমদের ফ্রিজে গরুর মাংস পাওয়া গেলে বর্বরতম নির্যাতন চালায় গেরুয়া সন্ত্রাসীরা।

আরবের বুকে যখন ইসলামের দাওয়াত প্রচারিত হচ্ছিল, ইসলাম গ্রহণের পরও ইহুদিরা উটের মাংস গ্রহণ করতো না। তখন আল্লাহ কুরআনে তাদের পরিপূর্ণ রূপে ইসলামে প্রবেশ করার বার্তা জানিয়ে আয়াত নাজিল করে দেন। ঠিক তেমনি করে এই উপমহাদেশেও শিরকি হিন্দুত্ববাদী সংস্কৃতির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রধান একটি নজরানা হচ্ছে খাদ্য তালিকায় গরুর মাংসকে প্রাধান্যের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা। অথচ, আজ বিভিন্ন ভার্সিটির হলে, খাবার হোটেলে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ধর্মানুভূতির কথা বিবেচনা করে অতিরিক্ত উদার হতে গিয়ে গরুর মাংসকে খাদ্য তালিকা থেকে ক্রমেই ছেঁটে ফেলা হচ্ছে। সাথে করে সময়ে সময়ে গরুর মাংসের ক্রমবর্ধমান মূল্য আজ মধ্যবিত্ত মুসলিমদের খাদ্য তালিকা থেকেও গরুর মাংস আজ বিলুপ্তির পথে।

ঈদুল আজহায় গরু কুরবানিকে কেন্দ্র করে সারা বছর বিফ বিরিয়ানি, বিফ বার্গার, বিফ স্টেক খাওয়া সেক্যুলার প্রগতিশীলরা ‘পশু হত্যা মহাপাপ’-এর মাতম তোলে। গরু কুরবানি না করে, সেই টাকা দিয়ে গরিবদের সাহায্য করতে বলে। যেখানে কুরবানির ঈদে গরু কুরবানি করা এই অঞ্চলের মুসলিমদের মুসলমানিত্বের মৌলিক শিয়ার। আর বহু দুস্থ মানুষ, যারা সারা বছর গরুর মাংস খেতে পায় না, তারা এই ঈদ উপলক্ষ্যে সেই সুযোগ পায়। বোঝাই যাচ্ছে কলকাতায় নাড়ি পোঁতা এসব সেক্যুলাঙ্গারদের

উদ্দেশ্য মানবিকতা নয়, বরং মুসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে এক কালচারাল যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া।

বাংলার মুসলিম উম্মাহ আজ ভাগ্য নির্ধারণী এক সময় পার করছে। শাহজালালের বাংলায় গেরুয়া সন্ত্রাস আজ সব ধরনের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এখন আকিদা ও ফিকহের মতভিন্নতাকে কেন্দ্র করে মতবিরোধ সৃষ্টির সময়। এখন নিয়ে মাসলাক-কেন্দ্রিক ওয়ালা বারা চর্চার সময় নয়। এখন ইস্যুকেন্দ্রিক আত্মপ্রবঞ্চনার সময় নয়। আমাদেরকে মূল সমস্যা হিসেবে হিন্দুত্ববাদকে চিহ্নিত করতে হবে। এদেশে কালচারাল জমিদারদের সেক্যুলার হেজেমনি প্রতিষ্ঠার পেছনেও কাজ করছে হিন্দুত্ববাদ। এদেশের সেক্যুলাররা ধর্মনিরপেক্ষ নয়। এরা ধর্মনিরপেক্ষতার বয়ানে ইসলামের শাখা-প্রশাখা কর্তন করে ইসলামের এক রসালো রূপকে সমাজে বৈধ করে দিয়েছে। যাকে আমরা বলি মডারেট ইসলাম।

দ্বীন, উম্মাহর হেফাজতে বাংলার মুসলিমদের আগামী ৭-৮ মাসের কার্যক্রমই নিশ্চিত করে দেবে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনে আমাদের এই উম্মাহর পরিণতি কতটা নির্মম হবে প্রথম পর্যায়ে। চূড়ান্ত পর্যায়ে অবশ্যই বিজয় আমাদেরই হবে। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া সুসংবাদ মিথ্যা হতে পারে না। হিন্দের জালিম শাসকদের গলায় বেড়ি পড়িয়ে আমরা আকসা পর্যন্ত নিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ।

বাস্তবতা হচ্ছে, গাজওয়াতুল হিন্দ আসলে শুরু হয়ে গেছে। কোনো যুদ্ধ প্রকাশ্যে আসার পূর্বে প্রাকপর্যায়ে কিছু লক্ষণ দেখা যায়। দেশের মিডিয়াগুলোতে, সংবাদপত্রগুলোতে, সাহিত্যে, সাংস্কৃতিক মঞ্চে, সমাজবাস্তবতায়, রাজনীতির ময়দানে হিন্দুত্ববাদীদের উত্তপ্ত উপস্থিতি চক্ষুষ্মানদের জন্য এই বাস্তব সত্য প্রকাশ করে দিচ্ছে কোন রাখ ঢাক না রেখেই।

ধর্মযুদ্ধের প্রবেশদ্বার

গাজওয়াতুল হিন্দের চূড়ান্ত মুখোমুখি লড়াইয়ের আশায় যারা বসে আছেন তারা আধুনিক বিশ্বের যুদ্ধনীতি সম্পর্কে জানেন না। তারা মনে করেন ঢাল-তলোয়ার, বন্দুক নিয়ে সম্মুখযুদ্ধ শুরু হলে কোনো এক আসমানি ইমামের ডাকে তারা যুদ্ধে নেমে পড়বেন।

একই বুঝের কারণে আমাদের অধিকাংশ আলেমগণ জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাওয়ার বহু বছর পরে এসেও সক্ষমতার ওজর দেখিয়ে উম্মাতকে শাহাদাতের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন। আমার আশঙ্কা, উনারাই সেই দলভুক্ত হয় যায় কি না, যেদিন ৮০টি পতাকার অধীনে কুফফারদের বিস্তৃত সৈন্যবহর দেখে মুসলিম বাহিনীর একটি অংশ জিহাদের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাবে, যাদেরকে আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না।

চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধনীতিতে শক্তিশালী শত্রুর মোকাবেলায় গেরিলা ওয়ারফেয়ারকে এজন্যই মোক্ষম স্ট্র্যাটেজি হিসেবে বেছে নিয়েছেন সারাবিশ্বের মুজাহিদ ভাইয়েরা। যার ফলাফল আমরা হাতেনাতে পেয়েছি ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্থানের বুকে, একই ফলাফল অতি শীঘ্রই আমরা সোমালিয়ার বুকেও দেখব ইনশাআল্লাহ।

এটা এমন এক যুদ্ধনীতি, যেখানে যুদ্ধবিরতি ও যুদ্ধকালীন সময়ের মধ্যে বিশেষ ফারাক করা যায় না। মিডিয়াকে সফলভাবে ব্যবহার করে শত্রু গোষ্ঠীর মনে ভয়ের শীতল ধারা প্রবাহিত করা যায়, শত্রুর যাবতীয় কু-চক্রান্ত বিশ্ববাসীর কাছে প্রকাশ করে দিয়ে শত্রুকে হীনমন্য করে দেওয়া যায়। মিডিয়াকে ব্যবহার করে শত্রুবাহিনীর জনগণকে তাদেরই সেনাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে শত্রুর জনসমর্থন নস্যাৎ করে ফেলা যায়। বিশাল শত্রুবাহিনীর বিপরীতে জনস্রোতে মিশে গিয়ে চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে নিরাপদে সরে যাওয়া যায়। শত্রুর কাছে আপনি তখন এক শক্তিমান অশরীরী আত্মার মতো। এই যুদ্ধনীতিতে একই সময়ে শত্রুকে বিভিন্ন ময়দানে আক্রমণ করে বিভ্রান্ত করা যায়, কারণ শত্রু আপনাকে আঘাত করার জন্য নির্দিষ্ট কোনো ময়দান খুঁজে পাবে

না। শত্রু যেখানে ভারী অস্ত্র নিয়ে আপনাকে হন্যে হয়ে খুঁজবে, সেখানে প্রাকৃতিক কিংবা মানবসৃষ্ট প্রতিরক্ষা ব্যূহ ব্যবহার করে হালকা অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই শত্রুর অধিক ক্ষতি করা সম্ভব। এতে করে দীর্ঘযুদ্ধে শত্রুর বড় রকমের আর্থিক ও মানসিক ক্ষতি করা সম্ভব।

আধুনিক যুদ্ধনীতির অংশ হিসেবে দিল্লির নির্দেশে মূল যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই বাংলার মিডিয়া কালচারে, সংস্কৃতির মঞ্চে, পত্রিকায়, প্রশাসনিক খাতে, বিচারালয়ে, জীবনমানের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সেক্যুলাঙ্গারদের চাপিয়ে দেওয়া হেজেমনি আমাদেরকে গাজওয়াতুল হিন্দ প্রকাশ্যে আসার ঠিক পূর্ব মুহূর্তের দামামাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

ধর্মনিরপেক্ষতার নাম দিয়ে রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে এরা ইসলামকে ছেঁটে ফেললেও মুসলিমদের নামাজ, রোজা, ঈদ, মুআমালাত মুআশারাত, পরিবারব্যবস্থা নিয়ে আপত্তি তোলেনি। কিন্তু, আজ ভার্সিটির ক্যাম্পাসগুলোতে নামাজের জামাত তৈরি হলে, ইফতার মাহফিল আয়োজিত হলে প্রগতিশীল পাড়ায় উত্তেজনা তৈরি হয়ে যায়। কুরআনের মাহফিলে পর্যন্ত তারা জঙ্গিবাদের গন্ধ খুঁজে পায়। মুসলিমদের রমজানকে বিষিয়ে দেওয়ার জন্য চিনির গুদামে আগুন, খেজুর এর বাজারে কৃত্রিম মূল্যস্ফীতি সৃষ্টি, সেহরিতে ভার্সিটির হলগুলোতে গরুর মাংস নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হচ্ছে। কুরবানির মতো মৌলিক শিয়ার নিয়ে আপত্তি তুলছে এরা কয়েক বছর ধরে। ভাবা যায়? বিদ্যানন্দের মতো ইসকনের প্রোডাক্টকে ব্যবহার করে মুসলমানের অর্থনীতি ব্যবস্থার মেরুদণ্ড যাকাতকে পর্যন্ত এরা মিটিয়ে দেওয়ার কাজে নেমেছে। ‘সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই’-কে সামনে এনে মুসলমানের আকিদা থেকে ওয়ালা-বারা এর মতো অপরিহার্য অংশকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিচ্ছে।

এই হিন্দুত্ববাদী সেক্যুলার হেজেমনির কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, ন্যায্য অধিকারকে খর্ব করে চূড়ান্তভাবে আইনি ধরপাকড়ের মাধ্যমে সমাজের তৃতীয় শ্রেণির জনগণে পরিণত করেছে। তাই আজকের এই সেক্যুলার হেজেমনিকে যদি আমরা গাজওয়াতুল হিন্দের প্রবেশ পথ হিসেবে ধরে না নেই, তাহলে আমরা আরও কয়েক দশক পিছিয়ে পড়ব।

অথচ আমাদের বিপরীতে গেরুয়া বাহিনী কিন্তু দেশের মাটিতেই নিজেদের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছে। চট্টগ্রামে “একটা একটা মোল্লা ধর, ধইরা ধইরা জবাই কর”, তারই বহিঃপ্রকাশ। কিংবা রথযাত্রার সময়ে প্রকাশ্যে শ্রী নিহার হালদারের মুখে মুসলিম মেরে সাফ করে শিবের তাণ্ডবলীলার মাধ্যমে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার যে গরম স্লোগান আমরা শুনি সেটাও একটা উত্তম উদাহরণ। গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিকের লিক হওয়া ভিডিও ফুটেজে স্পষ্ট বুঝা যায়, দিল্লির আজ্ঞাবহ দাসত্ব বরণ করে নেয়ার পরও ক্ষমতাসীন দলের উপর সন্তুষ্ট নয় তারা, তাদের আরও চাই। তাদের ক্ষুধা তো কেবল ভারত থেকে নেমে আসা গেরুয়া বাহিনীরাই নিবৃত্ত করতে পারবে এটা বোঝার জন্য রকেট সায়েন্স জানা লাগে না।

সুতরাং, যত তাড়াতাড়ি আমরা বাস্তবতা বুঝতে শিখব ততই উত্তম।

অস্তিত্বের সংকট মোকাবেলায় আমাদের করণীয়: ইতিহাসের পাতায় মুসলিম আত্মপরিচয়ের ডিসকোর্স অনুসন্ধান

হিন্দুত্ববাদকে লালন করা গেরুয়া সন্ত্রাসীদের আদর্শিক ভিত্তিমূল কিন্তু হিন্দু ধর্ম নয়। বরং, হাজার বছর ধরে উপমহাদেশের বুকে সনাতনীদের সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ। হাজার বছরের এই ঐতিহাসিক পথচলাকে পুঁজি করে নিজেদের সেই আধিপত্যবাদকে অধুনা এই বিশ্বে পুনরায় প্রতিষ্ঠার জন্য বর্তমানের শিবসেনা, রামসেনাদের বুদ্ধিবৃত্তিক গেরুয়া মস্তিষ্কধারীরা ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে এই অঞ্চলের মুসলিমদের বহিরাগত হিসেবে অধিষ্ঠিত করে, মুসলিমদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, অধিকারকে নির্বাসনে পাঠিয়ে সমাজের তৃতীয় শ্রেণির জনগণ হিসেবে মূল্যায়ন করছে, যেটাকে আমরা আজকের শিক্ষিত তাওহীদি সমাজ সেক্যুলার হেজেমনি বলছি। ইসলামি চেতনার স্ফুরণ দেখলেই প্রগতিশীল পাড়ায় যেই হুক্কা হুয়া শোনা যায়, "ইসলাম পালন করতে হলে আরবে চলে যাও, ইসলামের কথা বলতে চাইলে মাদ্রাসায় ভর্তি হও, ভার্সিটিতে এসেছো কেন?", সেগুলো আসলে সেই হিন্দুত্ববাদী আদর্শ থেকেই উৎসারিত। হাজার বছর পূর্বেও এদের আদিপুরুষ বহিরাগত আর্যরা এই অঞ্চলের ভূমিসন্তানদেরকে না-মানুষ হিসেবে পরিগণিত করতো।

সেজন্য, এই ভূমিতে হিন্দুত্ববাদকে মোকাবেলার জন্য সর্বপ্রথম ইতিহাসের পাতা থেকে বাংলার মুসলিমদের আত্মপরিচয়ের ডিসকোর্স খুঁজে বের করতে হবে। বাঙালি আত্মপরিচয়ের পেছনে বাংলার মুসলিম সালতানাতের ভূমিকা, বাংলার সমাজজীবনের আধুনিকায়নের পেছনে মুসলিম সুলতানদের অগ্রণী কার্যক্রম জানতে হবে। আপনি যদি আজ ইতিহাস থেকে বঞ্চিত থাকেন, আধিপত্যবাদীরা বিকৃত ইতিহাস রচনা করে আপনার অস্তিত্বকে প্রশ্নের মুখে ফেলবে। আরাকানি মুসলিমদের পথচলা বাংলায় ইসলামের পথচলা শুরু হওয়ারও ৩০০ বছর আগেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু, আজ তাদের পরিণতি আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। তারা তাদের ইতিহাস থেকে বঞ্চিত ছিল। তাদের এত এত মাদ্রাসা, ইলমি খিদমত তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারেনি। ক্রমেই ধেয়ে

আসা বিপর্যয়কে ইতিহাস বঞ্চিত আরাকান এর মুসলিম মোকাবেলা করতে পারেনি। আজ আমরাও যদি নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে উদাসীন থাকি, আমাদের বখতিয়ার খলজিই আমাদের চোখে শত্রু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। ক্লাস সেভেনের ২০২৩ সালের ইতিহাস শিক্ষা বইয়ে সেই কাজটি সূক্ষ্মভাবে করা হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই।

এই অঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পেছনে সুফিদের অবদানকে আমাদের কিছু দ্বীনি ভাইয়েরা অপছন্দ করতে পারেন, কিন্তু তাদের অস্বীকার করার অর্থ এই ভূমির বুকে আপনি নিজের ধর্মীয় অস্তিত্বকে ছেঁটে ফেলতে চাইছেন। আমাদেরকে খুব হিসেবি হতে হবে ভাইয়েরা। আমরা একটি যুদ্ধের মধ্যে আছি। মাসলাকি দৃষ্টিভঙ্গিকে পাশে রেখে মাসলাহা-মাফসাদা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের।

আমি তাই কেবল মাত্র একটি বই আপনাদের সবাইকে পড়তে হাতজোড় করে অনুরোধ করব। কবি মুসা আল হাফিজ এর ‘বাংলাদেশ ও ইসলাম: আত্মপরিচয়ের ডিসকোর্স’ বইটি নিয়ে মসজিদকেন্দ্রিক পাঠচক্র তৈরি করে হলেও পড়বেন এবং শিক্ষণীয় পয়েন্টগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন নিজেরা। একে-অপরকে জানাবেন, যারা জানে না তাদেরকে গল্পের মতো করে এই ভূমির বুকে মুসলিমদের ঐতিহাসিক অস্তিত্বের সত্যতা তুলে ধরবেন। হিন্দুত্ববাদীদের চাপানো ইতিহাস বিকৃতির খণ্ডন করবেন। আলেমদেরকে হাদিয়া হিসেবে দিবেন এই বইটি। মাদ্রাসাগুলোর লাইব্রেরিতে যদি এই বইটি স্থান পায় তবে খুব উত্তম হবে। সম্ভব হলে ‘বাংলার মুসলিমদের ঐতিহাসিক ভিত্তি’ শিরোনামে নিজ এলাকায় লিফলেট ও পোস্টার ক্যাম্পেইন করুন। যারা ভিডিও এডিটিং পারেন, তারা অনলাইনে প্রচারের জন্য আকর্ষণীয়, তথ্যবহুল, যুক্তিনির্ভর ভিডিও কনটেন্ট তৈরি করতে পারেন। এই ভূমির বুকে মুসলিমদের পটপরিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে জানার একটি ক্ষুধা তৈরি করুন সকলের মধ্যে।

আপনারা যদি এই কাজটি করতে ব্যর্থ হন, তবে পরিণতি কী হবে সেটাও বলে দিচ্ছি, আজ অনেক মুসলিমদের দেখবেন ফিলিস্তিনের উপর মুসলিমদের অধিকার নিয়ে সংশয়ে আপতিত হয়েছে, তারা এই ভূমিকে বনী ইসরাঈলের জন্যই খাস ভাবছে। অথচ নাফরমান বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তাআলার পবিত্র এই ভূমির ওয়াদা ছিল

শর্তযুক্ত। আমরা বনী ইসরাঈলের সেই অবাধ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন নই বলেই, জায়নবাদী বিশ্বব্যবস্থা সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে জারজ রাষ্ট্র গ্রেটার ইজরায়েল প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে গেছে বহুদূর। আমাদের বেলায়ও একই পরিণতি অপেক্ষা করবে, যদি আমরা আমাদের ইতিহাসের বেলায় অবহেলা করি।

অস্তিত্বের সংকট মোকাবেলায় আমাদের করণীয়: আল ওয়ালা ওয়াল বারা-এর বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা

‘আল ওয়ালা ওয়াল বারা’ অর্থাৎ বন্ধুত্ব ও শত্রুতা কেবল আল্লাহরই জন্য, উম্মতের ভুলে যাওয়া এক আবশ্যকীয় আকিদা।

শুধু ঈমানী পরিচয়ের ভিত্তিতে সারা বিশ্বের মুসলিম আমরা এক উম্মাহ আর তাওহীদ অস্বীকার করে কুফরের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য কাফের-মুশরিকদের সাথে আমাদের আজীবনের বিরোধ, এরই নাম হচ্ছে আল ওয়ালা ওয়াল বারা। অর্থাৎ, আমাদের বন্ধুত্ব ও শত্রুতার মাপকাঠিও আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও অবাধ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারিত। আল্লাহ তাআলা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে মুসলিম জাতির পিতা হিসেবে ঘোষণা করেছেন, আমাদের আদেশ করেছেন মিল্লাতে ইব্রাহিমের আদর্শ অনুসরণ করতে। কী সেই আদর্শ? আল্লাহ তাআলা নিজেই তা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন,

“ইবরাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলছিল, ‘তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর উপাসনা করো তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি; এবং উদ্রেক হলো আমাদের-তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো।”
(সূরা আল মুমতাহিনা, আয়াত ৪)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা ও ঘৃণাকে ঈমানের পূর্ণতার মানদণ্ড বলে আখ্যা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

" مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ "

অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসবে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য শত্রুতা করবে; আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য দান করবে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য দান করা থেকে বিরত থাকবে, সে ব্যক্তি তার ঈমান পরিপূর্ণ করেছে।"

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه, হাদীস নং ৪৬৮১)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন,

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

“মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাথীগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর দয়াশীল।”

(সূরা ফাতহ, আয়াত ২৯)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরে ইবনে কাসিরে সূরা আল মায়িদার ৫৪ নম্বর আয়াতে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য পেশ করে ইমাম ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديداً عنيفاً على الكفار، رحيماً براً بالأخيار، غضوباً عبوساً في وجه الكافر، ضحوكاً بشوشاً في وجه أخيه المؤمن

অর্থ: এসব হচ্ছে মুমিনদের গুণাবলি। একজন মুমিন কাফেরদের উপর কঠিন-কঠোর হবে। আর উত্তম ব্যক্তি তথা মুমিনদের প্রতি হবে দয়ালু ও কোমল। কাফেরের মোকাবিলায় ক্রুদ্ধ ও ভ্রুকুঞ্চিত হবে, আর তার মুমিন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতে হাস্যোজ্জ্বল-আনন্দিত হবে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে সাহাবায়ে কেরামের জামাতের যেসব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন, সেগুলো হচ্ছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى
ۚ لَائِمٍ لَوْمَةَ يَخَافُونَ وَلَا اللَّهِ سَبِيلِ فِي يُجَاهِدُونَ الْكَافِرِينَ عَلَى أَعِزَّةٍ الْمُؤْمِنِينَ

“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের মধ্যে যে তার দ্বীন থেকে ফিরে যাবে, অচিরেই আল্লাহ তাআলা এমন জাতিকে নিয়ে আসবেন, যাদের তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালোবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের

প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না...”
(সূরা মায়িদাহ, আয়াত ৫৪)

এখানে আল্লাহ তাআলা আল ওয়ালা ওয়াল বারা অর্থাৎ কেবল তার সন্তুষ্টির জন্যই আমাদের ভালোবাসা ও কঠোরতা ধারণ করাকে দ্বীনের অংশ হিসেবে সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। আর যারা এই ওয়ালা বারা থেকে সরে যাবে, তাদের পরিবর্তে তিনি অন্য জাতিকে তার এই দ্বীন জিন্দা করার জিম্মা দিবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন, যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহয় অবতীর্ণ হতে শত্রুর কোনো কুৎসার পরোয়া করবে না।

বিপরীতে আজ আমরা অসাম্প্রদায়িক চেতনার ব্যানারে, কুফফারদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করছি আর সারা বিশ্বের মাজলুম মুসলিম উম্মাহর প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছি। কাফেরদের দুর্দশায় আমাদের সহানুভূতি উপচে পড়লেও, মুমিনের বিপদের আমাদের অন্তরে আঁচড়ও কাটে না। পশ্চিমা সব মানবরচিত কুফরি মতবাদের দাসত্বে লিপ্ত উম্মাহ আজ কুফফারদের প্রাপ্য কঠোরতা মুমিনদের প্রতি প্রদর্শন করছে।

অথচ, মুসলিম উম্মাহকে এক দেহের সাথে তুলনা দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

" مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى "

“মু’মিনদের একে-অপরের প্রতি সম্প্রীতি, দয়া ও মায়া-মমতার উদাহরণ (একটি) দেহের মতো। যখন দেহের কোন অঙ্গ পীড়িত হয়, তখন তার জন্য সারা দেহ অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।”
(সহীহ মুসলিম, كتاب البر والصلة والآداب-باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم - ৬৫৮৬, অনুরূপ হাদীস - সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদাব, باب رحمة الناس والبهائم - ৬০১১)

উম্মাহ আজ কুফর ও শিরকের কারণে কাফের-মুশরিকদের প্রতি বিদ্বেষ, কঠোরতা লালনের বিপরীতে পশ্চিমা আদর্শ ধারণ করে মুমিনদের সাথে কাফের, মুশরিক, মুনাফিক, মুরতাদ, নাস্তিক শাতিমে রাসূলের সকল বিভেদ মুছে দিয়ে শুধু মানুষ পরিচয়ে সবাইকে এক কাতারে শামিল করতে চায়। আল ওয়ালা ওয়াল বারা ভুলে যাওয়া উম্মাহ আজ ঈমান ও কুফরের মধ্যে কোনো বিভেদ তৈরিকে সাম্প্রদায়িকতা হিসেবে দেখছে। সূরা আল মায়িদার ৫৪ নম্বর আয়াত অনুযায়ী এই উম্মতের বিরাট অংশই আজ আল ওয়ালা ওয়াল বারা ভুলে গিয়ে দ্বীন থেকেই ফিরে গেছে।

অথচ, আল্লাহ তাআলা বলেন,
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسلامِ دينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخاسِرينَ
"আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন চায় তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"
(সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৮৫)

এই আয়াত জানার পর, আল্লাহর কোনো ঈমানদার বান্দা কি অসাম্প্রদায়িক চেতনার দাসত্ব করতে পারে? কারণ,

إِنَّ الدّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسلام
"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট দ্বীন হচ্ছে ইসলাম।"
(সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯)

দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে জাহিল মুসলিম আজ রহমতের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানবিক চরিত্রের দোহাই দিয়ে কাফের-মুশরিক, এমনকি গোস্তাখে রাসূলের (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবমাননাকারী) প্রতিও কঠোর হওয়াকে উগ্রবাদী আচরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। তাওহীদে বিশ্বাস একজন মানুষের জানমাল-ইজ্জতের নিরাপত্তা দেয়। আর যে তাওহীদ গ্রহণ বা ঈমান আনে না তার জান-মালেরও কোনো নিরাপত্তা থাকে না। কেননা, শিরক-কুফরি এমনই জঘন্য অপরাধ। এ ব্যাপারে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

আবু হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আমি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা বলে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ সুতরাং যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর সাক্ষ্য দেবে তাঁর জান ও মাল-সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ। তবে ইসলামের কোনো হক ব্যতীত। আর তাঁর অন্তরের হিসাব আল্লাহ তাআলার উপর ন্যস্ত।”
(বুখারী, মুসলিম ১/৫২, হাদীস নং - ২১, নাসায়ী - ৬/4 হাদীস নং - ৩০৯০)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—
"كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه"
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুমিনদের কাছে মুশরিকদের অবস্থান ছিল দু-ধরনের। কিছু মুশরিক ছিল যুদ্ধরত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন তারাও তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো। আর কিছু মুশরিক ছিল চুক্তিবদ্ধ। তিনিও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন না তারাও তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত না।
(সহীহ বুখারী, কিতাবুত তালাক, অধ্যায় - নিকাহু মান আসলামা মিনাল মুশরিকাত ...)

বর্তমানে যেহেতু খিলাফত ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত ইসলামি রাষ্ট্র কাঠামো বিদ্যমান নেই, তাই কাফেরদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার কোনো সুযোগও নেই। তাই উপরের দুই হাদীস এবং সূরা আল ফাতহ এর ২৯ নম্বর আয়াত আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, চুক্তিবিহীন কাফের-মুশরিকদের প্রতি মুমিনরা কঠোরতা ব্যতীত অন্য কোনো আচরণ প্রদর্শন করতে পারে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী ও সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাহকে পাশে রেখে ভিন্ন কোন আদর্শ ধারণ করে কুফফারদের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন আসলে দ্বীন ইসলাম থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার নাম।

আল্লাহ তাআলা বলেন,
“তুমি পাবে না এমন জাতিকে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে, বন্ধুত্ব করে তার সাথে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, যদিও তারা তাদের পিতা, অথবা পুত্র, অথবা ভাই, অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। এরাই, যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান

লিখে দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে রুহ দ্বারা তাদের শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতসমূহে যার নিচে দিয়ে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এরাই আল্লাহর দল। জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহর দলই সফলকাম।"

(সূরা আল মুজাদালাহ, আয়াত ২২)

"তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ, যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে বিনীত হয়ে। আর যে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী।"

(সূরা আল মায়িদা, আয়াত ৫৫-৫৬)

বিপরীতে, আজ যারা মানবরচিত কুফরি জীবনব্যবস্থাকে বাতিল ঘোষণা করে তাওহীদের আপোষহীন দাওয়াত দিতে চায়, গুরাবা হিসেবে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন ইসলামের পতাকা বুলন্দ করতে চায়, তাদেরকে এই উম্মাহ মৌলবাদী, উগ্রবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, চরমপন্থী, জঙ্গিবাদী হিসেবে চিহ্নিত করছে। আর যে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী জোটের হাতে আফগান, আরাকান, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, সিরিয়া, ইরাক, সোমালিয়া, চেচনিয়া, উইঘুরসহ সারা বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ সামরিক আগ্রাসনের শিকার হচ্ছে, তাদের প্রতি ঈমানী চেতনাবিলুপ্ত আদর্শিক দাসত্বে লিপ্ত মুসলিম জাতির মুগ্ধতা, অনুকরণ, অনুসরণের অন্ত নাই।

হিন্দুত্ববাদী গেরুয়া অপশক্তিকে সফলভাবে মোকাবেলার জন্য অবশ্যই আমাদের আকীদায় আল ওয়ালা ওয়াল বারার ব্যাপারগুলো স্পষ্ট থাকতে হবে। নতুবা দেখা যাবে, ভারতীয় শিবসেনা, রামসেনারা যখন মুসলিমদের পবিত্র রক্ত দিয়ে হলি খেলার সূচনা করবে, আমাদের সমাজেরই নামধারী মুসলিমরা সর্বপ্রথম কাফেরদের বিরোধিতায় আমাদের বিপক্ষে অবস্থান নেবে। তাই আমার দ্বীনি ভাইদের বলব, আপনারা নিজের আকীদায় ওয়ালা বারাকে মজবুত করুন। আলেমদের কাছে গিয়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত পড়াশুনা করুন। অবহেলা করবেন না। নিজ এলাকায় ওয়ালা বারা এর দাওয়াত ছড়িয়ে

দিতে বিভিন্ন দাওয়াতি ক্যাম্পেইন করুন হক্কানী উলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে। কাফেরদের সাথে উঠাবসায় আমাদের সম্পর্ক ও লেনদেন কেমন হবে উলামায়ে কেরাম থেকে জেনে নিয়ে কুরআন ও হাদীস থেকে দলিল যুক্ত করে পোস্টারিং করে, লিফলেটিং করে সবাইকে জানিয়ে দিন।

এই উম্মাহর ওয়ালা বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নিজ মাসলাককেন্দ্রিক ফিকহি ইখতিলাফ ও আকিদাকেন্দ্রিক শাখাগত মতভিন্নতার উপর। এই উম্মত নিজ মাসলাক কেন্দ্রিক ইখতিলাফের উপর ঐক্যবদ্ধ হতে চাচ্ছে। নিশ্চয়ই এটা বিভ্রান্তির কর্দমাক্ত পথ। আমাদেরকে অবশ্যই ঈমানী ভ্রাতৃত্ববোধ এর ভিত্তিতে কুফফারদের বিরুদ্ধে শিরক-কুফর মূলোৎপাটনের আদর্শে সারা বিশ্বের মুসলিম এক উম্মাহ হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

উম্মাহর রাহবার, নবীগণের ওয়ারিশ, উলামায়ে কেরামদের বলব, আপনারা মিম্বর থেকে জুমার খুতবাগুলোতে আল ওয়ালা ওয়াল বারা নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা শুরু করুন। তাফসীর মাহফিলে ওয়ালা বারা-কেন্দ্রিক আয়াতগুলো উম্মতের কাছে ভেঙে ভেঙে তুলে ধরুন। মসজিদের তালিমে, মজলিসগুলোতে আকিদার এই অবিচ্ছেদ্য অংশকে তুলে আনতেই হবে। আল ওয়ালা ওয়াল বারা 'আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও কুফর বর্জন' তথা আমাদের শাহাদাহর অংশ। ঈমানদার কখনোই কুফরের উপরে সন্তুষ্ট হতে পারে না। ইনসাফের সীমারেখা স্পষ্ট করে দিয়ে আমাদের সমাজের কাফের-মুশরিকদের প্রতি মুসলিমদের মুআমালাত-মুআশারাত কেমন হবে তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তুলে ধরুন। আপনারা যদি উম্মাহর এই ক্রান্তিলগ্নে ঘুমন্ত উম্মাহর চেতনার জাগরণীতে মুখ্য ভূমিকা পালন না করেন, ক্রমেই ধেয়ে আসা গাজওয়াতুল হিন্দে বেগায়রত এই উম্মাহর নিরীহ রক্তের দাগ আপনাদের হাতে এসেই লাগবে। ওয়াল্লাহি আমার মালিক সর্বোত্তম ইনসাফকারী। সেইদিন কে ভয় করুন, যেদিন আপনাদের সকল ওজর ও সীমাবদ্ধতা আল্লাহর আনুগত্যের প্রশ্নের কাছে এসে পরাজিত হয়ে যাবে। দুনিয়ার বুকে মুমিন তো মুসাফির। আল্লাহর জন্য হিম্মত করুন, হে প্রিয় রাহবার।

অস্তিত্বের সংকট মোকাবেলায় আমাদের করণীয়: মুসলমানিত্বের সাথে সাংঘর্ষিক বাঙালিয়ানাকে অস্বীকার

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জন যখন বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা দিলেন, তখন পূর্ববঙ্গের জনগণ নিজেদের অধিকার, সুযোগ-সুবিধা, জীবনমানের উন্নতি ঘটবে, এই আশায় পক্ষে থাকলেও, কলকাতা-কেন্দ্রিক পশ্চিমবঙ্গের গেরুয়া পুরুত ঠাকুরদের পক্ষ থেকে আসে জোরালো বিরোধিতা। পুরো ব্রিটিশ আমল জুড়ে সাদা চামড়ার বিলেতি সাহেবদের কাছ থেকে সুযোগ সুবিধা পেয়ে, অর্ধ সহস্রাব্দ আগে বাংলার মুসলিম সালতানাতের কাছে নিজেদের আধিপত্য হারানো কলকাতার ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষক গোষ্ঠী পূর্ববঙ্গের মুসলিমদের উপর পুনরায় যেই জমিদারিত্ব কায়েম করেছিল, সেটা বিলীন হয়ে যাক তা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি। তাই তো পৈত্রিকভাবে পতিতালয়ের ব্যবসায় বাজিমাত করা রবিঠাকুররা 'আমার সোনার বাংলা'-র মতো চরম জাতীয়তাবাদী সঙ্গীত রচনা করে ফেলে, যা এখন আমাদের কাছে এই কুফরি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটি অন্যতম পূজনীয় সাংস্কৃতিক উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলার মুসলিমদের উপর হিন্দুত্ববাদী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সেই লড়াইয়ে জিতে গেলেও ১৯৪৭ এর দেশভাগের পর, মানবরচিত জাতিরাষ্ট্রের কাঁটাতারে বিদ্ধ হয়ে কলকাতা-কেন্দ্রিক সেই জমিদারিত্বের চূড়ান্ত পতন ঘটে। তাইতো নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তানকে পুনরায় অধিগ্রহণের জন্য বাংলার সরল মুসলিমদের উপর কলকাতা-কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই পরিচালনা শুরু হয়। বাংলায় মুসলিমদের মুসলমানিত্ব টিকিয়ে রাখতে, তাদের উপর গেরুয়া আধিপত্য খর্ব করতে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর ২৩ বছর জুড়ে চলা শোষণনীতিকে ইতিহাসের পাতায় আজ আমরা যতটা অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখি ঠিক ততটাই আলোকোজ্জ্বল দেখি ১৯০ বছরের ব্রিটিশ কলোনিয়াল পিরিয়ডকে। যারা ব্রিটিশদের থেকে ফায়দা লুফে নিয়ে নিজেদের হিন্দুত্ববাদী জমিদারিত্ব কায়েম করেছিল, তারাই আজ ইতিহাসকে নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী রচনা করে বাংলার মুসলিমদের উপর নিজেদের আধিপত্যকে শক্ত ভিত্তি দিয়েছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের গর্বিত সুর ঢাকাই মুসলিমদের গলায় যতটা ভক্তির সাথে ঝরে পড়ে, তার চেয়েও

বহুগুণে বেশি আকারে ঝরে পড়ে কলকাতার ‘দাদা, খেয়ে এসচেন, নাকি গিয়ে খাবেন’-দের ঘরে। **১৯৭১** এর বিজয় কি বাংলার সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম উম্মাহর জিল্লতি থেকে মুক্তির উপলক্ষ্য ছিল, নাকি পুনরায় রক্ষিতা হিসেবে কলকাতার সাংস্কৃতিক হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীর কাছে গিয়ে পড়ার মতো অবস্থা ছিল সেটা আজ সচেতন তাওহীদবাদীদের কাছে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ আজ ধর্মীয় অনুশাসনের বিপরীতে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেমে এই অঞ্চলের মুসলিমদের মধ্যে আত্মপরিচয়ের সংকট তৈরি করেছে। অথচ এই বাঙালি আত্মপরিচয়ের সূচনা হয়েছিল আমাদেরই মুসলিম সালতানাতের হাত ধরে। পূর্ব বাংলা যখন বঙ্গ, হরিকেল, সমতট, রাঢ়, বরেন্দ্রভূমির মতো বিচ্ছিন্ন সব জনপদে বিভক্ত ছিল তখন বাংলার সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ পুরো বাংলাকে একত্র করে ‘বাঙ্গালাহ’ নামকরণ করেন এবং নিজে ‘শাহ-ই-বাঙ্গালাহ’ লকব ধারণ করেন। আর্যীয় হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনে বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক এই অঞ্চলের ভূমিপুত্রদের সংস্কৃতি যখন বিলুপ্তির পথে তখনই বাংলার মুসলিম সুলতানগণ প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বাংলা ভাষাকে নবযৌবন দান করেন। অথচ বাংলা সংস্কৃতির উপাদান হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে আজ পহেলা বৈশাখ, মঙ্গল শোভাযাত্রা, ভাস্কর্য নির্মাণ, মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানো, আলপনা অঙ্কনের মতো হিন্দুদের শিরকি অনুষঙ্গকে গেলানো হচ্ছে আমাদের। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের সংস্কৃতি, জীবনাচরণকে বাংলা সংস্কৃতি থেকে ছেঁটে ফেলা হচ্ছে ক্রমাগত। রমজানের ইফতার মাহফিল বন্ধের ঘোষণা, হোটেল-ভার্সিটির হলগুলোতে গরুর মাংস খাবার তালিকা থেকে ক্রমেই উঠে যাওয়া, গরু কুরবানিকে অমানবিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা, বছরের দুই ঈদকে ক্রমেই তাৎপর্যহীন করে তোলা তারই কিছু নমুনা।

তাই, হিন্দুত্ববাদী গেরুয়া আগ্রাসনকে রুখে দিতে হলে আমাদের অবশ্যই সেক্যুলার সাংস্কৃতিক নাস্তিক্যজোট এবং কুফরি গণতন্ত্র-পূজারী রাষ্ট্রপক্ষের চাপিয়ে দেওয়া এই বাঙালিয়ানা, বাঙালি জাতীয়তাবাদকে অস্বীকার করতেই হবে, এর সাথে জড়িত সকল অনুষঙ্গকে (জাতীয় সঙ্গীত, সংবিধান, বিভিন্ন চেতনা দিবস....)-কে ছুড়ে ফেলতে হবে। আদর্শিকভাবে আপোষহীন না হলে, ময়দানের লড়াইয়ে রক্ত ঝরানো সম্ভব না।

হিন্দুত্ববাদী শিরকি সংস্কৃতির মোড়কে জড়ানো এই বাঙালি কুফরি জাতীয়তাবাদকে বর্জন করতে পারলে তবেই আমাদের উপর চেপে বসা সেক্যুলার প্রগতিশীল সমাজের আধিপত্যকে ভেঙে গুড়িয়ে দিতে পারব। আদর্শিক ও সাংস্কৃতিকভাবে বাংলার জমিনে তাওহীদের চেতনার শিকড় ছড়িয়ে পড়বে তখন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের অবশ্যই কান্দাহারের সেই মুকুটহীন সম্রাট এবং আরবের সেই রাজপুত্তুরের আদর্শকে ধারণ করতে হবে হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে এই অসম লড়াইয়ে বিজয়ী হতে হলে, যাদের একজন ভিন্ন জাতীয়তার মুসলিম ভাইয়ের জানমাল রক্ষায় নিজের মসনদকে কুরবানি করেছিলেন, অপরজন আলিশান নিরাপদ জীবনকে ছুড়ে ফেলে, দ্বীন ও উম্মাহর হেফাজতে তোরাবোরা এর গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমাদেরও একমাত্র ঈমানী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে দ্বীন ও উম্মাহর জিম্মা আদায়ে মুহাজির ও আনসারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। আমাদের ভালোবাসা, সম্প্রীতি, সহযোগিতা, ঐক্যের ভিত্তি হবে কেবল আমাদের মুসলমানিত্ব।

আমাদের উলামায়ে কেরামের ঈমানী গায়রতের দেয়ালে আজ এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়ার সময় হয়েছে, কুফরি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে জানমাল বিলিয়ে বিলীন হলে কি আদৌ শাহাদাত এর মর্যাদা পাওয়া যাবে, নাকি জাহিলিয়াত এর পতাকা তলেই তার মৃত্যু হবে, যার সাথে নবীজী নিজেকে ১৪০০ বছর আগেই সম্পর্কমুক্ত ঘোষণা করেছেন?

আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে, আমরা কি আল্লাহর দাস হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে চাই, নাকি হিন্দুত্ববাদী মোদীর রক্ষিতা জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের দাস হয়ে বিদায় নিতে চাই? বাঙালির হাজার বছরের জাতীয়তাকে তাওহীদের সাথে সম্পৃক্ত করার ডাক সর্বপ্রথম মসজিদের মিম্বর থেকে উচ্চারিত হতে হবে। মসজিদকেন্দ্রিক ঈমানী পরিচয়ের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ সমাজব্যবস্থার বুনিয়াদ হতে হবে মণ্ডপভিত্তিক এদেশীয় শিরকি গেরুয়া দোসরদের বিপরীতে। মুসলিম আত্মপরিচয়কে আঁকড়ে ধরতে হবে সর্বাগ্রে। আমাদেরকে অবশ্যই নিজ কওমের অস্তিত্ব, নিরাপত্তা ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে।

অস্তিত্বের সংকট মোকাবেলায় আমাদের করণীয়: সেইভ আওয়ার সিস্টার্স

আপনাদের হয়তো জানা আছে, হিন্দু মেয়েরা তাদের পিতা থেকে ওয়ারিশ-সূত্রে কোনো সম্পত্তি পায় না। তাদের সাথে এসময় তাদের ভাইয়েরা না-মানুষ হিসেবে আচরণ করে। বিয়ের সময়ও অত্যধিক যৌতুক আদায় করতে হয় মেয়ের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য হিন্দু পারিবারিক কাঠামোতে। বিয়ের সময় হিন্দু সমাজে প্রচলিত কট্টর কৌলীন্য প্রথার কারণে মেয়েদের চরম ভোগান্তির স্বীকার হতে হয়। হিন্দুধর্মে ছেলে শিশুর জন্মের পর খতনার কোনো বিধান নেই। অধিকাংশ পুরুষ তাই জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে এসে যৌন রোগে আক্রান্ত হয়। স্বাভাবিকভাবেই তাই হিন্দু নারীরা তাদের স্বামীর সোহাগ থেকে বঞ্চিত হয়। এছাড়া হিন্দুদের হাজারো শিরকি পুজোৎসবে আনন্দ-উদযাপনের অংশ হিসেবে বাড়ির পুরুষ সদস্যরা নাক অবধি ডুবিয়ে মদ পান করে মাতলামির ঢেঁকুর তোলে। আর হিন্দুধর্মে যেহেতু স্ত্রীর সম্মান ও অধিকার রক্ষা-বিষয়ক নির্দেশনা অনুপস্থিত, উল্টো স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা নারীরা হিন্দু সমাজে তৃতীয় শ্রেণির অচ্ছুত জনগণ হিসেবে গণ্য হয়। তাই হিন্দু পরিবার কাঠামোতে নারীদের দুর্ভোগের শেষ নেই।

অপরদিকে, ইসলাম নারীকে যে সম্মান দিয়েছে, তা আধুনিক পুঁজিবাদী সেক্যুলার বিশ্ব নারীর অধিকার, সমতা ও স্বাধীনতার মতো মুখরোচক ন্যারেটিভ প্রতিষ্ঠা করেও দিতে পারেনি। ইসলামে নারী তার বাবা, ভাই, স্বামী, ছেলে থেকে ওয়ারিশসূত্রে মিরাসি সম্পত্তির মালিক হতে পারে। ইসলামে যৌতুক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। উল্টো বিয়ের সময় স্ত্রীর মোহর আদায় করা স্বামীর জন্য ওয়াজিব। নারীর নিরাপত্তার দায়িত্ব পুরুষের উপর, নারীকে 'রাব্বিয়াতুল বাইত' অর্থাৎ ঘরের রানী হিসেবে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছে। 'মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত'-ঘোষণার মাধ্যমে মাতৃত্বকে যে সম্মান ইসলাম দিয়েছে, সেটা পৃথিবীর কোনো ধর্ম দেয়নি। ইসলামে 'আসাবিয়্যাত' তথা উগ্র গোত্রপ্রীতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এর বিপরীতে কেবল তাকওয়ার বিনিময়ে মুসলিম হিসেবে একের ওপর অপরের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছেন নবীজী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ঘরের স্ত্রীকে তার স্বামীর চরিত্রের সার্টিফিকেট হিসেবে গণ্য করা হয় ইসলামে। স্ত্রী যেন কোনোভাবে শরীয়ত নির্ধারিত অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, সেজন্য ইসলামের রয়েছে কঠোর দিকনির্দেশনা।

ইসলামের এতসব নারীকল্যাণমুখী নীতির কারণে উগ্র হিন্দুত্ববাদের চাষাবাদ হওয়া ভারতে নারীদের বঞ্চনার মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় অধিকার সচেতন, সত্যান্বেষী নারীরা ইসলামের দিকে ধাবিত হওয়া শুরু করে। ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম পরিচয় ধারণ করে মুসলিম পুরুষের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। নিজেদের ধর্মীয় নীতির সকল সীমাবদ্ধতাকে ঢাকতে, গেরুয়া সন্ত্রাসীরা ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিমদেরকে কোণঠাসা করে, তাদের স্বপ্নের নাপাক রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দুত্ববাদী হেজেমনি প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে একে তাই মুসলিমদের 'লাভ জিহাদ' হিসেবে গণহারে আখ্যায়িত করা শুরু করে। প্রতিশোধ হিসেবে তাই ভারতে মুসলিম নারীদের যে সীমাহীন লাঞ্ছনা, অপমানের স্বীকার হতে হয়, তারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে 'ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপ'। মুসলিম নারীদের সতীত্বকে নষ্ট করে নিজেদের যৌনদাসী হিসেবে ব্যবহারের যে অকথ্য নোংরা প্রকল্প ভারতের বুকে বাস্তবায়িত হচ্ছে খুল্লামখুল্লাভাবে, তা-ই আজ প্রকট আকারে শাহজালালের বাংলায় প্রকাশ পাচ্ছে।

নিজেদের মুসলিম সহপাঠী বিশেষ করে নিকাবি ও হিজাবি বোনদের টার্গেট করে সংখ্যালঘু হিন্দুরা আজ ভাগওয়া লাভট্র্যাপের চক্রান্ত বাস্তবায়ন করছে। তাদের চক্রান্তকে আরও বেশি করে রং চড়িয়ে সংখ্যাগুরু মুসলিম উম্মাহকে উসকানি দিতে অনলাইনে তারা নিজেরাই হাজারো স্ক্রিনশটের মাধ্যমে ভাইরাল করে দিচ্ছে। ইসলামের প্রতি নিজেদের মুগ্ধতার গল্প ফেঁদে সরলমনা মুসলিম বোনদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে, কালো জাদু করে, তার সম্ভ্রম নষ্ট করে, ক্রমাগত ব্ল্যাকমেইলের মাধ্যমে তাকে ধর্মান্তরিত করে শাঁখা-সিঁদুর পড়তে বাধ্য করছে সংখ্যালঘু নাপাক মালাউনরা। কখনো কখনো এই বোনদের ভারতে যৌনপল্লীতে বিক্রিও করে দেওয়া হচ্ছে। বিবাহিত, সাংসারিক জীবনে অসুখী মুসলিম নারীদেরও টার্গেট করা হচ্ছে। মুসলিম নারীদের পবিত্র গর্ভে আজ হিন্দুত্ববাদী গেরুয়া সন্ত্রাসীদের নাপাক বীর্য স্থান করে নিচ্ছে।

পেট চালানোর নীতির কাছে ঈমান বিক্রি করে দেওয়া আমাদের বাবা মায়েরা নিজেদের সামাজিক মর্যাদাকে ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর প্রাধান্য দিতে গিয়ে, নিজেদের মেয়েকে পুঁজিবাদী বিশ্বের স্বার্থ হাসিলকারী নারীবাদী কর্পোরেট স্লেইভ বানানোর মিশনে এমন এক শিক্ষাব্যবস্থার সাথে যুক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করে, যে শিক্ষাব্যবস্থায় আজ আমাদের বোনেরা পশ্চিমাদের শেখানো স্বাধীনতা, সমতা ও অধিকারের বুলি হজম করে নিজের গায়রতের, ইজ্জত-আব্রুর জানাজা পড়িয়ে ফেলে। ফলে সে সহজেই হিন্দুত্ববাদী গেরুয়া সন্ত্রাসীদের লালসার শিকার হয়।

যখনই ভাগওয়া লাভট্র্যাপ সংক্রান্ত স্ক্রিনশট অনলাইনে ভাইরাল হয়, আমাদের দ্বীনি ভাইদের মধ্যে প্রতিবাদ এর ঝড় উঠে যায়, প্রতিশোধের জজবায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তৈরি হয়। আমাদের বুঝতে হবে, এটাই কিন্তু ওরা চাচ্ছে। ওরা চায় সংখ্যাগুরু মুসলিম জনতা উত্তেজিত হয়ে হিন্দুদের এই জঘন্য অপকর্মের বদলা গ্রহণ করুক গণহারে। যেন করে সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব রক্ষায় আন্তর্জাতিক মহলের অনুমতি নিয়ে ভারতীয় মুসলিম রক্তপিপাসু গেরুয়া সেনারা নেমে এসে এদেশের সার্বভৌমত্বকে বলী দিয়ে 'অখণ্ড ভারত' প্রতিষ্ঠা করতে পারে। খেয়াল করলে দেখবেন, ওরা কোন বোনকে টার্গেট করছে, কেন টার্গেট করছে, ওদের বিকৃত লালসাপূর্ণ কথোপকথন সবটাই ওরা ভাইরাল করে দিচ্ছে। আর দেশের প্রশাসনেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিন্দুত্ববাদী দালালদের উপস্থিতি থাকার কারণে ওরা আরও বেশি নির্ভার। তাই আমাদেরকে সাবধানি হতে হবে। অ্যাকশন, পাল্টা রিএকশনের মাধ্যমে আমরা ওদের বহু বছরের অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার এই আঞ্চলিক সাম্রাজ্যবাদী চেতনার মোকাবেলা করতে পারব না। আমাদের দরকার পরিকল্পনা-মাফিক কাঠামোবদ্ধ অ্যাকটিভিজম। কারণ সঠিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত ময়দানের যুদ্ধে বিজয় অর্জন সম্ভব নয়।

তাওহীদবাদী দ্বীনি ভাইদের বলব, এলাকায় দাওয়াতি কাফেলা তৈরি করুন। হানাফি-সালাফি পরিচয়ে নিজেদের মধ্যে দূরত্ব রাখবেন না। এলাকার খতিবদের কাছে যান, ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপ সংক্রান্ত নিউজগুলোর স্ক্রিনশট, ওদের ভাইরাল হওয়া নোংরা মেসেজগুলো দেখিয়ে সচেতন করুন। এসব ঘটনাকে প্রামাণ্য হিসেবে তুলে ধরে

পোস্টার ও লিফলেট ডিজাইন করে নিজেদের এলাকায় ছড়িয়ে দিন। বোন থাকলে নিজ পরিবারের মধ্যে এসব বিষয়ে সচেতনতামূলক দাওয়াত আলোচনা করুন।

হারাম সম্পর্ক ও ফ্রি মিক্সিং সংক্রান্ত আলোচনা শুধু মাত্র ১৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সারা বছর জারি রাখতে হবে এবং অনলাইন-অফলাইন দাওয়াতি ক্যাম্পেইন ও লিফলেটিং, পোস্টারিং অ্যাকটিভিজম চালিয়ে যেতে হবে।

হলিউড ও বলিউডের নোংরা সংস্কৃতি আমাদের রক্ষণশীল মুসলিম সমাজের নৈতিকতাকে ধুয়ে ফেলেছে। ভিন্ন ধর্মের সঙ্গিনীর প্রতি আকর্ষণ তৈরিকে আজ স্বাধীনতা হিসেবে দেখা হচ্ছে। উদার নৈতিকতার বয়ানে সব ধর্মকে আজ মানবতার প্রশ্নে সমান পাল্লায় এনে হাজির করা হচ্ছে মিডিয়া কালচারের মাধ্যমে। ঈমান-কুফরের আর কোনো বিভেদরেখা থাকছে না। তাই এই নাস্তিক্যবাদী সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে না বলতে হবে।

আলেমদের উচিত মিম্বর থেকে ইসলামি পর্দার ফরজ বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য ধারাবাহিক আলোচনা, সেমিনার ও খুতবার ব্যবস্থা করা। সমাজে প্রচলিত শালীনতার মানদণ্ডকে উম্মতের কাছে বাতিল হিসেবে তুলে ধরতে হবে। নিজেদের জীবনমানের নিরাপত্তা ও উম্মতের খিদমতের নামে নারীদের হারাম সহশিক্ষাতে যুক্ত না করার ব্যাপারে শরয়ী বিধান পর্যাপ্ত যুক্তি সহকারে অভিভাবকদের কাছে তুলে ধরতে হবে। কুফরি নারীবাদী আদর্শের স্বরূপ দাওয়াতি ভাষায় তুলে আনতে হবে।

ইসলামি পরিবার কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। নারীদের মিরাস ও মোহরানার সম্পত্তি যেন তারা সঠিকভাবে নিজেদের অধিকারে পায়, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। ইসলাম-স্বীকৃত বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ, ডিভোর্সি বিবাহকে স্বাভাবিক করতে হবে।

মসজিদ-কেন্দ্রিক সমাজকাঠামো প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। হিন্দুদের উপস্থিতি আছে, এমন সমাজে 'আল ওয়ালা ওয়াল বারা'-এর মূলনীতিগুলো ভেঙে ভেঙে তুলে ধরে অমুসলিমদের সাথে আমাদের মুআমালাত, মুআশারাত কেমন হবে সেটা তুলে ধরতে হবে।

নওমুসলিমদের জন্য সাহায্যকারী ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে মসজিদের সচ্ছল মুসল্লিদের। নওমুসলিমদের সহায়তায় আমাদেরকে মদীনার আনসার সাহাবীদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। আমাদের ঘরগুলোকে নওমুসলিমদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে যেন ব্যবহার করা যায় সেই ব্যবস্থা নিতে হবে।

তাবলীগের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সরকারি প্রভাবশালী পেশাজীবীদের সাথে (যেমন - আইনজীবী, সাংবাদিক) দাওয়াতি সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার আধিপত্য প্রতিষ্ঠায়। তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করে মাঝে মধ্যে হাদিয়া দিতে হবে তাদের আস্থা অর্জনের জন্য। দরকার হলে এলাকার স্থানীয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন লোকদের আমাদের দাওয়াতি বলয়ে আনতে হবে। তাদেরকে বোঝাতে হবে আপনি কোনো রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি নন। কেবল ইসলাম ও এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম নাগরিকের জান-মালের নিরাপত্তা এবং দেশের সার্বিক অখণ্ডতা, বাংলার মুসলিমদের সার্বভৌমত্ব, সংখ্যালঘুদের চরমপন্থার ব্যাপারে আপনারা উদ্বিগ্ন। এগুলো আমাদের দাওয়াতি স্ট্র্যাটেজি। মনে রাখবেন, তাদের প্রতি আমাদের আকিদাগত দর্শনের জায়গায় কোনো আপোষ নেই আর যুদ্ধ মানেই ধোঁকা। আপনাদের মাথায় রাখতে হবে যে, আকিদা ও সিয়াসত এর মধ্যে আমাদের মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে। বাড়াবাড়ি, ছাড়াছাড়ির দিকে যাওয়া যাবে না।

অস্তিত্বের সংকট মোকাবেলায় আমাদের করণীয়: মাজলুম ফরজের পুনরুজ্জীবন

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا ما لَكُم إِذا قيلَ لَكُمُ انفِروا في سَبيلِ اللَّهِ اثّاقَلتُم إِلَى الأَرضِ أَرَضيتُم بِالحَياةِ الدُّنيا مِنَ الآخِرَةِ فَما مَتاعُ الحَياةِ الدُّنيا فِي الآخِرَةِ إِلّا قَليلٌ

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হলো, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) বের হও, তখন তোমরা জমিনের প্রতি প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়ো? তবে কি তোমরা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হলে? অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী আখিরাতের তুলনায় একেবারেই নগণ্য।"
(সূরা আত তাওবাহ, আয়াত ৩৮)

ইবনু উমার (রা.) এর সূত্র থেকে বর্ণিত,
তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "যখন তোমরা জিহাদ ছেড়ে দেবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা ও অপমান চাপিয়ে দেবেন। তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদেরকে এই অপমান থেকে মুক্তি দেবেন না।"
(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৪৬২)

আজ বাস্তবেই আমরা আল্লাহর ফরজ করে দেওয়া জিহাদের বিধানকে 'আল ওয়াহহান'-এর কাছে বিক্রি করে দিয়েছি। মুসলিম উম্মাহর মগজে আজ জায়নিস্ট ষড়যন্ত্র, হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাস প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে। অথচ মদীনার নববি যুগে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমদের তরবারিই সকল কুফফারদের ফিতনা মোকাবেলায় যথেষ্ট ছিল। ৩১৩ জন সাহাবী ততক্ষণ বদরের প্রান্তরে জিহাদের ঝান্ডা উঁচিয়ে রেখেছিলেন, যতক্ষণ না ফিতনা খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন কেবল আল্লাহর হয়ে যায়। তাই যতদিন সমগ্র উম্মাহ জিহাদে না জড়াবে ততদিন উম্মাহর ঘাড় থেকে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের জুজু দূর হবে না, গেরুয়া বাহিনীর সামনে আমাদের অপমান, লাঞ্ছনার শেষ হবে না।

কুফফার বাহিনীর শক্তিমত্তার কাছে মানসিকভাবে পরাজিত হয়ে যাওয়া উম্মাহর একাংশ বদরের প্রান্তরে আল্লাহর পাঠানো আসমানি গায়েবী মদদের উপরে তাওয়াক্কুল হারিয়ে ফেলেছে। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন,

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ المُؤمِنينَ عَلَى القِتالِ إِن يَكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يَغلِبوا مِائَتَينِ وَإِن يَكُن مِنكُم مِائَةٌ يَغلِبوا أَلفًا مِنَ الَّذينَ كَفَروا بِأَنَّهُم قَومٌ لا يَفقَهونَ

"হে নবী, তুমি মুমিনদেরকে লড়াইয়ে উৎসাহ দাও, যদি তোমাদের মধ্য থেকে বিশজন ধৈর্যশীল থাকে, তারা দুইশো জনকে পরাস্ত করবে, আর যদি তোমাদের মধ্যে একশ জন থাকে, তারা কাফেরদের এক হাজার জনকে পরাস্ত করবে। কারণ, তারা (কাফেররা) এমন কওম যারা বোঝে না।"
(সূরা আল আনফাল, আয়াত ৬৫)

মুতার যুদ্ধে রোমানদের বিরুদ্ধে অসম লড়াইয়ে মুমিনদের ঈমানী জজবা, তাকওয়া, আল্লাহর সাহায্যের উপর তাওয়াক্কুল এবং সবরই তাদেরকে দিগ্বিজয়ী রোমানদের বিপরীতে ইস্পাত কঠিন অবস্থানে নিয়ে গিয়েছিল। মনে রাখতে হবে, মুসলিম উম্মাহর বিজয়ের জন্য শর্ত শুধু আমাদের তাকওয়া ও সংকল্প। সক্ষমতার বিচারে আমরা সব সময়েই পিছিয়ে ছিলাম। কিন্তু আমাদের ঈমানী গায়রত ও আল্লাহর উপর ভরসা আমাদেরকে কখনোই আল্লাহর নুসরত প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করেনি। জিহাদের ময়দানেই আল্লাহর আসমানি সাহায্য তাওহীদে উলুহিয়্যাহর পরীক্ষা দিতে আসা মুজাহিদীনদের সামনে সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পেয়ে থাকে। অপরদিকে, আমরা কেবল বাস্তববাদী দুনিয়ার পুঁজিবাদী মারপ্যাঁচে রাজনীতি বুঝেছি বেশি, উম্মাহর চাহিদা ও শরিয়তের দাবি বুঝিনি।

কুফফারদের বিপরীতে সক্ষমতার প্রশ্নে আজ যারা জিহাদের ফরজিয়্যাতকে গোপন করে সমাজে, তাদের বোধোদয়ের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِباطِ الخَيلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُم وَآخَرينَ مِن دونِهِم لا تَعلَمونَهُمُ اللَّهُ يَعلَمُهُم وَما تُنفِقوا مِن شَيءٍ في سَبيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيكُم وَأَنتُم لا تُظلَمونَ

“আর তাদের মোকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত করো, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদের তোমরা জানো না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করো, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দেয়া হবে, আর তোমাদেরকে জুলুম করা হবে না।”
(সূরা আল আনফাল, আয়াত ৬০)

যারা জিহাদের জন্য ইমাম থাকা ও কোনো ইসলামি ভূখণ্ডের অধিকারী হওয়াকে শর্ত হিসেবে সামনে আনতে চায়, তাদের কাছে এই অধমের জিজ্ঞাসা, হুদায়বিয়ার সন্ধির কারণে মদিনা থেকে চলে যেতে বাধ্য হওয়া সাহাবী আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইকদামী জিহাদগুলোকে কীভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করবেন, যেখান স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রশংসা করেছেন? তিনি কোন স্বাধীন ইসলামি ভূখণ্ডের অধিবাসী ছিলেন? অথবা তার পরিচালিত জিহাদগুলোর ইমাম কে ছিল?

ফিকহের কিতাবগুলোতে জিহাদ ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ স্পষ্ট করে লেখা আছে। অথচ সেখানে ইমাম বা ঝান্ডা বিদ্যমান থাকার কোনো শর্ত উল্লেখ করা নেই। যারা জিহাদের বৈধতার জন্য ইমাম বিদ্যমান থাকা কিংবা ইসলামি রাষ্ট্র বিদ্যমান থাকাকে শর্ত হিসেবে উপস্থাপন করতে চাইছে, তারা কেন ইমারত-খিলাফত প্রতিষ্ঠায় কাজ করে না? তারা কেন শুরা গঠন করে, আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ গঠন করে আমিরের হাতে বাইয়াত নিচ্ছে না? সারাজীবন আকিদার পরিশুদ্ধির দাওয়াত দিয়ে যাওয়া মানুষগুলো কেন লাগামহীনভাবে মুসলিম ভূমিগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানদের মুসলিম শাসক হিসেবে উপস্থাপন করছে, যেখানে এই শাসকেরা আল্লাহর বিধানকে ছুঁড়ে ফেলে মানবরচিত শাসন বিধান কায়েম করে গায়রুল্লাহর উলুহিয়্যাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাগুতে পরিণত হয়েছে? জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর দাওয়াত প্রচারকে যারা ফিতনা হিসেবে দেখছে তারা গাজওয়াতুল হিন্দের বরকতময় কাফেলায় যুক্ত হবে বলে আপনাদের মনে হয়?

হকপন্থী আলেমগণ এই ভূমিকে দাওয়াহর ভূমি হিসেবেই শনাক্ত করেছেন। তাছাড়া এই ভূমির চারপাশ হিন্দুত্ববাদীদের বেড়াজাল এবং বিস্তৃত জলরাশি দ্বারা আবদ্ধ। তাই

চূড়ান্ত গাজওয়াতুল হিন্দ উপনীত হওয়ার পূর্বে এই ভূমিকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করতে ব্যাপক দাওয়াতি কাজ প্রয়োজন। দরকার ইদাদ, প্রস্তুতি। কারণ, আদর্শিক ভিত্তি মজবুত না হলে, শত্রুর বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াইয়ে যুদ্ধ ভুলে যাওয়া উম্মাহ ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আর শত্রু যখন আপনার থেকে শক্তিমত্তায় বড়, তখন চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধনীতি ব্যবহার করে গেরিলা যুদ্ধে শত্রুর দম্ভকে চূর্ণ করতে হলে, অবশ্যই আপনাকে লড়াইয়ের ময়দানে দীর্ঘ সময় টিকে থাকতে পারতে হবে।

হিন্দুত্ববাদী গেরুয়া সেনাদের মোকাবেলায় জিহাদের মাজলুম ফরজিয়্যাতকে শাহজালাল, তিতুমীর এর ভূমিতে পুনরায় জিন্দা করতে হলে আমাদের কিছু কাজ করতে হবে—

১. জিহাদের ফরজিয়্যাত তুলে ধরে উম্মাহকে জিহাদের সাথে জড়ানোর জন্য চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধনীতি অনুযায়ী মানসিক ও শারীরিক, আর্থিক প্রস্তুতি গ্রহণের দাওয়াত দিতে হবে।
২. জিহাদের ব্যাপারে, সমাজে প্রচলিত ভিত্তিহীন আপত্তি ও সেক্যুলার বিশ্বব্যবস্থার চাপানো প্রোপাগান্ডাগুলোর খণ্ডনকে সহজবোধ্য ভাষায় সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।
৩. বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় ইসলামের বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক মূল শত্রুকে চিনিয়ে দিতে পারতে হবে।
৪. ইমারত-খিলাফতকেন্দ্রিক জীবনের সুযোগ-সুবিধা সমাজে ব্যাপক আকারে প্রচার করতে হবে।

আমাদের বুঝতে হবে, গণতান্ত্রিক সেক্যুলার জীবনব্যবস্থাকে যারা উম্মাহর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে দেশের মসনদ দখল করে রেখেছে, তারা নিজেরাও বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক সাম্রাজ্যবাদী তাগুত গোষ্ঠীর কাছে রাজনৈতিকভাবে জিম্মি হয়ে আছে। তাই আমাদেরকে সাপের মাথায় গিয়ে আঘাত করতে হবে, লেজ ছেড়ে দিয়ে। উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র ভারত এই অঞ্চলের রাজনীতির পট-পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা, বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা চর্চায় উৎসাহ দেয়ার আড়ালে কলকাতা-কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক হিন্দুত্ববাদকে যারা উম্মাহর

উপর চাপিয়ে দিয়েছে তাদের মূল শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করতে পারতে হবে। আমাদের মূল জিহাদ তাদের বিরুদ্ধেই। তারাই নিয়ন্ত্রণ করে দেশের মসনদে টিকে থাকার চাবিকাঠি। তাদের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই তাদের পোষ্য পেটোয়া লাঠিয়াল বাহিনীর মাধ্যমে শাপলা, বায়তুল মোকাররম, ভোলা, শহীদবাড়িয়াতে মুসলিমদের রক্তে এই জমিন জিহাদের জন্য উর্বর হয়েছিল।

অনলাইনে দ্বীনিমহল প্রতিদিনই বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে গরম থাকে। ক্রমেই ধেয়ে আসা হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন সম্পর্কে আমাদের জজবাগুলো ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপ ও ভারতীয় পণ্য বয়কট করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। কুফরের এই সমাজে তাওহীদকে মূল কুঠারাঘাত হিসেবে প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছি আমরা। ইস্যুগুলোকেই মূল সমস্যা হিসেবে দেখছি। বিভিন্ন ইস্যুর জন্য বিভিন্ন সমাধান খুঁজে আনছি। জাহেলি জীবনব্যবস্থার মোকাবেলায় আমাদের অবশ্যই সেই নববী জীবনধারায় ফিরতে হবে। বহু গুরাবা দায়ী ইলাল্লাহ ভাই অনলাইনে ইখলাসের সাথে মাজলুম ফরজের দাওয়াতি কাজ করে কটূক্তির স্বীকার হচ্ছে, হতোদ্যম হয়ে পড়ছে। আমাদের বুঝতে হবে যে, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর ব্যাপারে সেক্যুলার প্রোপাগান্ডা ও আমাদের আলেমদের ভিত্তিহীন ইশকালের নসভিত্তিক যুক্তিসম্মত খণ্ডন ব্যতীত জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এর দাওয়াত প্রতিষ্ঠা সম্ভব না বাংলার এই জমিনে।

হিন্দুত্ববাদকে রুখে দেওয়ার জন্য আমাদের সকল অ্যাক্টিভিজম মূলত আপাতদৃষ্টিতে জিহাদের জন্য স্ট্র্যাটেজিকভাবে সংকুল এই ভূমিকে গেরুয়া আধিপত্য বিনাশে জিহাদের মাজলুম ফরজ জিন্দা করারই পরিকল্পনা মাত্র। জিহাদের ব্যাপারে সংশয়ে ভোগা সত্যান্বেষী সকল ভাইদের উদ্দেশ্যে উপমহাদেশে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাস রুখে দিতে সাংগঠনিকভাবে জিহাদী আনজামকে নেতৃত্ব দিয়ে শহীদ হওয়া মাওলানা আসেম উমর রাহিমাহুল্লাহ-র একটি কথা স্মরণ করিয়ে এই লেখার ইস্তফা দিচ্ছি,

"যদি আপনার দুর্বলতার ওজর থাকে, আপনি কুরআন খুলে দেখুন, দুর্বলদের শক্তিশালী করার জন্যই জিহাদকে ফরজ করা হয়েছে। . . .

স্মরণে রাখুন, জিহাদ শক্তিশালীদের দাম্ভিকতাকে খতম এবং মিটিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ফরজ করা হয়েছে।”

অনন্ত মহাকালে মোর যাত্রা, অসীম মহাকাশের অন্তে

দিল্লির নির্দেশে '১৩ সালে শাহবাগ প্রতিষ্ঠিতই হয়েছিল বাংলার জমিন থেকে ইসলামের রাজনৈতিক প্রভাবকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য। কারণ, তথাকথিত স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তিরা দেশ বিভাগের পর থেকেই বাঙালিয়ানার উপর ভিত্তি করে গঠিত বাংলাদেশ নামক নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র বিনির্মাণের পেছনে পার্শ্ববর্তী কলকাতা-কেন্দ্রিক গেরুয়া পুরুত ঠাকুরদের হিন্দুত্ববাদী সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের ব্যাপারে বেশ সচেতনভাবেই ওয়াকিবহাল ছিল।

কুফরি গণতন্ত্রের অনুশীলন করলেও জামাত, শিবিরকে কেন্দ্র করে যে সেক্যুলার হেজেমনি, ক্রিমিনালাইজিং প্রজেক্ট এই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা মূলত হিন্দুত্ববাদকে ইসলামের ব্যানারে রাজনৈতিকভাবে রুখে দেয়ার যে প্রয়াস, তারই বিপরীত ডিসকোর্স।

'১৯ সালে গুজরাটের মুসলিম রক্তপিপাসু মোদীর পেইড লাঠিয়াল বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে শহীদ হওয়া বুয়েটের আবরার হত্যাকাণ্ডকে কেবল ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক নোংরা গণতান্ত্রিক রাজনীতির অনুশীলন কিংবা Ragging Culture হিসেবে ধরে নিলে মারাত্মক ভুল করবেন। আবরারকেও শিবির সন্দেহে পিটিয়ে মারা হয়েছিল। আর শিবিরের বিরুদ্ধে যেকোনো ক্রিমিনালাইজিং প্রজেক্ট রাজনৈতিকভাবে বৈধ করে ফেলেছে ভারতের কাছে নিজের সম্ভ্রম বিক্রি করে দেওয়া আওয়ামী ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্র। আবরার শিবিরের সাথে যুক্ত না থাকলেও, তার কলমের খোঁচায় ফাঁস হয়ে যাচ্ছিল অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার নোংরা ষড়যন্ত্র।

আবরারের মতো মেধাবী শিক্ষার্থীদের কল্যাণে শিক্ষিত মহল থেকে যদি হিন্দুত্ববাদী উগ্র সাম্প্রদায়িক আদর্শের বিরুদ্ধে বাঁধা তৈরি হয়, তাহলে সেটাকে এড়িয়ে যাওয়া সুযোগ নেই। সাধারণ জনগণকে ছেলে ভোলানো কথা শুনিয়ে বশ করা যায়, সচেতন শিক্ষিত মহলকে না। আর আজকের শিক্ষার্থীরা আগামীর বাংলাদেশের মস্তিষ্ক স্বরূপ। তাই,

আবরারকে দ্রুত জীবননাট্যের গল্প থেকে মুছে ফেলে দিল্লির হাতে লাগাম চলে যাওয়া বুয়েট ছাত্রলীগের সদস্যরা।

সমস্যা যেটা হয়েছে সেটা হলো, আবরারের কুরবানি থেকে আমরা হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের মুখোশকে মোকাবেলার আদর্শ গ্রহণ করতে পারিনি। বরং, তার কুরবানিকে কেবল ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক রাজনীতির অনুশীলন এবং Ragging Culture এর বিরোধিতায় সীমাবদ্ধ করে রেখেছি। আমাদের সেই অসচেতনতার সুযোগটাই আবার কাজে লাগাতে পুনরায় দিল্লির নির্দেশে বুয়েটে ছাত্রলীগের প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। খেয়াল করলে দেখবেন, মিডিয়ার সামনে যে ৬ জন বুয়েট ক্যাম্পাসে রাজনীতি চর্চার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাওয়া আপামর শিক্ষার্থীদের সেই পুরোনো স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি জামাত শিবিরের আদর্শে দীক্ষিত হিসেবে দায় দিয়ে গণতান্ত্রিক ছাত্র রাজনীতি বুয়েটে ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছে, তাদের ৪ জনই কিন্তু হিন্দু।

আপনাদের আগেভাগেই সাবধান করে দিচ্ছি, দিল্লির কাছে বিক্রি হয়ে যাওয়া ছাত্রলীগের প্রভাবশালী এই অংশটা কেবল বুয়েটেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। ধীরে ধীরে সকল শিক্ষাঙ্গনগুলোতে ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপ তথা গেরুয়া আগ্রাসনের ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি, আদর্শ বিনির্মাণ ও প্রতিরোধের জন্য শিক্ষার্থীরা যেন ইসলামি আদর্শ চর্চার দিকে ঝুঁকে না পড়ে, সেজন্যই ব্যাপকভাবে শিবির নিধন শিরোনামে ইসলামপন্থী শিক্ষার্থীদের উপর যেকোনো ডিহিউম্যানাইজিং প্রজেক্ট বাস্তবায়নের জন্য শিকড় গেড়ে বসবে মোদীর ভারতের কাছে রক্ষিতা হয়ে থাকা আওয়ামী ধর্মের বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাধীনতার চেতনায় উদ্ভাসিত ছুপা রামসেনারা। দেখবেন, চূড়ান্ত গাজওয়াতুল হিন্দ শুরু হলে ছাত্রলীগের হিন্দু সদস্যরাই সর্বপ্রথম বেপরোয়া আচরণ শুরু করবে বাঙালি মুসলিমদের সাথে। আল্লাহ চাইলে তখন ছাত্রলীগ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। এক ভাগে থাকবে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সদস্যরা, নিজ দলের আনুগত্যের কাছে ঈমান বিক্রি করে দেওয়া মুসলিম নামধারী হুকুমের দাসেরা। আর আরেক ভাগে থাকবে অন্তরচক্ষু খুলে যাওয়া মুসলিম জালিম সদস্যরা। দ্বিতীয় দলটি সংখ্যায় ছোট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আল্লাহ চাইলে এরা গোমরাহি ছেড়ে উম্মাহর হেফাজতে আমাদের পাশে দাঁড়াবে তখন।

তাই, বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করার সময় এখন নয়। তাওহীদকেকে সরিয়ে রেখে ইস্যুভিত্তিক সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে মাথা গরম করার সময় এখন নয়। এখন সময় সকল ইখতিলাফকে দূরে রেখে, হানাফি-সালাফি বিরোধ দূরে রেখে, সকল মুসলিম ভাই-ভাই হিসেবে কাফেলাবদ্ধ হওয়ার এবং হিন্দুত্ববাদের মোকাবেলায় পরিকল্পিত এবং ধারাবাহিক আদর্শিক, সামরিক, অর্থনৈতিক প্রস্তুতি গ্রহণ করার।

দারুল আমানে অস্তিত্বের সংঘাতের বাস্তবতা

হিন্দুত্ববাদী নাপাক মুশরিকদের চট্টগ্রামে প্রকাশ্যে 'একটা একটা মোল্লা ধর, ধইরা ধইরা জবাই কর' স্লোগান, চাঁদা তোলাকে কেন্দ্র করে নিজেরাই নিজেদের মন্দিরে আগুন দিয়ে ২ জন মুসলিমকে শহীদ করে দেওয়া, রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে মূর্তির পায়ের সামনে কুরআন রাখার পরিবেশ করে দেওয়া এবং এর দায় মুসলিমদের উপর চাপানো, অনলাইনে প্রকাশ্যে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠায় সনাতনীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় গণহারে মুসলিম নিধনের বিবৃতি, মুসলিম নারীদের সম্ভ্রম হনন করে সেটা নিয়ে অনলাইনে উল্লাস করা, এসব কিছুর পেছনে এদেশীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের ষড়যন্ত্র, প্রস্তুতি অল্প কয়েক বছরের নয়। ভারত থেকে রামসেনাদের কাছে বিশেষ প্রস্তুতিও নিয়ে আসেনি।

বাস্তবতা হচ্ছে, দেশ বিভাগের পর থেকেই ইসলামের অস্তিত্ব বাঙালির মনন থেকে বিলুপ্ত করার জন্য, হিন্দুত্ববাদী বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক অনুশীলনকে বাঙালি সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদ চর্চার নাম দিয়ে যেভাবে স্বাধীনতার পক্ষ শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে আদর্শিকভাবে সেটাই পরবর্তীতে বাঙালি মুসলিম সমাজ থেকে ওয়ালা বারা-র আমলকে মিটিয়ে দিয়ে হিন্দুত্ববাদী গেরুয়া অপশক্তির বিরুদ্ধে অসাম্প্রদায়িক হতে শিখিয়েছে। সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায়, বহির্বিশ্বের কুনজর থেকে মসনদ টেকাতে আঞ্চলিক শক্তির কাছে মাথানত করে দেশ ও জাতির নিরাপত্তাকে প্রশ্নের মুখে ফেলা দেওয়া হয়েছে বছরের পর বছর ধরে চলা কুফরি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ডিসকোর্সগুলোতে। মসনদ রক্ষায় গণতান্ত্রিক বিরোধে জয়ী হতে দিল্লির মুসলিম রক্তপিপাসু মোদীর হাতে স্বেচ্ছায় জিম্মি হয়ে প্রশাসনিক, সামরিক, শিক্ষাখাতে, মিডিয়াতে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার চিন্তায় বিভোর দেশের সার্বভৌমত্ব-বিরোধী সংখ্যালঘু হিন্দুদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

দেশটা নাকি ৯০ শতাংশ মুসলমানের, অথচ ৯০ শতাংশ মুসলমানের জন্য এদেশে শরীয়াহ আইন নেই। রবের উলুহিইয়্যাতের জিম্মা গায়রুল্লাহ ছিনিয়ে মসনদে বসে আছে। সেই মসনদের নিয়ন্ত্রণ আবার পেন্টাগন ও দিল্লির কাছে। ৯০ শতাংশ

মুসলমানের কথিত দারুল আমানকে সংখ্যালঘু হিন্দুরা নিজেদের আজন্ম লালিত অখণ্ড ভারতের অংশ ভেবে মুসলিম নিধনে প্রকাশ্য মহড়া দেয় অস্ত্র-শস্ত্রসহ। আর মুসলিম সেখানে ঘোড়ায় চড়ে রাজপথে নেমে এলে মামলা হামলার শিকার হয়, মাদ্রাসাগুলোতে কুরবানির আগ মুহূর্তে কুরবানির সরঞ্জাম পাওয়া গেলে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়। দেশটা কি আদৌ ৯০% মুসলমানের?

এদেশীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে পূর্বে নিজেদের নির্দোষ, ভিক্টিম হিসেবে উপস্থাপন করার প্রবণতা চোখে পড়ার মতো হলেও অল্প সময়ের মধ্যে তারা নিজেদের মানসিকতায় আগ্রাসী চেতনা ধারণ করতে পেরেছে। এটা আপনাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, যেকোনো বিপ্লবের পেছনে যদি শক্তিশালী আদর্শিক এবং অর্থনৈতিক ভিত্তি না থাকে, তবে সে বিপ্লব ফলদায়ক হয় না। হিন্দুত্ববাদীদের আদর্শিক অবস্থান তৈরি হয়েছে বহু বছর ধরেই। একজন হিন্দুও দেখাতে পারবেন না নিরীহ, অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার আদর্শে বিশ্বাসী নয়। বরং, বাস্তবতা হচ্ছে আজ হিন্দু মানেই হিন্দুত্ববাদী। সেটা সে আপনার কাছে প্রকাশ করুক আর না করুক। প্রতিটা হিন্দু আজ আপনাদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তিতে লিপ্ত। আপনার ঘাড়ে মরণ কামড় দিতে অর্থনীতিক ভিত্তি শক্তিশালী করতে ব্যস্ত। মন্দিরে মন্দিরে অস্ত্র জমা করে প্রস্তুত। সংখ্যালঘু আসলে কারা?

ইসকনের বিরুদ্ধে গত বছর নাম মাত্র মূল্যে চট্টগ্রামে পাহাড়ি অঞ্চলে শত শত একর জমি ক্রয় করার অভিযোগ এসেছিল, মনে আছে? চট্টগ্রামের সচেতন মুসলিম মাত্রই জানবেন, চট্টগ্রামে হিন্দুরা বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংঘের অধীনে কতটা ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী। চট্টগ্রামে প্রবর্তক ইসকন মন্দির এবং বিজেপির অর্থায়নে নির্মিত কৈবর্তধাম মন্দির সংলগ্ন বিরাট অঞ্চলে শত শত কোটি টাকার বিনিয়োগ সেখানকার সচেতন মুসলিমদের কাছে অজানা নয়। পাহাড়ি অঞ্চলের গভীরে হিন্দুরা নিজেদের এক অভয়ারণ্য গড়ে তুলতে পেরেছে অল্প সময়ের মধ্যেই। মুসলিম নিধনে এদেশীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের হিন্দুত্ববাদী গেরুয়া সেনায় পরিণত করতে ইসকন যদি দেয় আর্থিক সহায়তা, তবে বিজেপি দিয়েছে রাজনৈতিক সহায়তা। আপনার চেনা ভূমিতেই যদি আপনি এতটা আধিপত্য, নিরাপত্তা, প্রস্তুতি অর্জনের সুযোগ পান, কেন শুধু শুধু আবার ভারতে হিজরত করবেন প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য? রোহিঙ্গাদের শিবিরে যেখানে

সাধারণ দায়ী ইলাল্লাহ ও উলামায়ে কেরামই প্রবেশ করতে পারেন না ইসলামের দাওয়াত নিয়ে, সেখানে ইসকনের বিরুদ্ধে শক্ত অভিযোগ রয়েছে রোহিঙ্গাদের অস্ত্র দিয়ে দেশের মধ্যে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা নিয়ে।

সহজ কথা বুঝতে হবে, আমাদের এই কথিত দারুল আমান আমাদের জন্য গাজওয়াতুল হিন্দের প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে বদ্ধ খাঁচা হলেও হিন্দুদের জন্য কিন্তু বদ্ধ খাঁচা নয়। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের ৩ দিকে হিন্দু রাষ্ট্র ভারতের উপস্থিতি আমাদেরকে যতটা নাজুক অবস্থায় রেখেছে, হিন্দুদের ততটাই সুবিধাজনক অবস্থানে রেখেছে। তাই তো ওরা প্রকাশ্যে অস্ত্রের মহড়া দিলে সন্ত্রাসী হয় না আর কদিন পর পর দাড়ি টুপিওয়ালাদের খিলাফত প্রতিষ্ঠার আদর্শ রাখায় গুম করে চরমপন্থী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, জঙ্গিবাদী হিসেবে মিডিয়ার সামনে উপস্থাপন করা হয়।

দেশের সকল মহাসড়কগুলোকে আজ ৪ লেন, ৮ লেনে উন্নীত করা হয়েছে। সেভেন সিস্টার্স যেন চীনের তৎপরতায় ভারতের মানচিত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা না করে সেজন্য সেই অঞ্চলে দিল্লির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকে সহজ করতে স্থল ও নৌ বন্দরে বিনা শুল্কে ট্রানজিট দেওয়া হয়েছে। পদ্মাসেতু সহ দেশের অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন যতটা না দেশের মানুষের স্বার্থে তার চেয়ে বেশি দিল্লির স্বার্থে। হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন নিয়ে সচেতন মুসলিম মাত্রই বুঝবেন, এই উন্নয়নের পথ ধরেই আমাদের উপর নেমে আসবে গেরুয়া হানাদার বাহিনীর মুহুর্মুহু রক্তক্ষয়ী আক্রমণ।

সুতরাং, ভারত উপমহাদেশের মানচিত্র থেকে মুসলমানিত্বের শেষ চিহ্নটুকু মুছে দিয়ে কথিত রামরাজ্য প্রতিষ্ঠায় হিন্দুত্ববাদীদের বহু বছরের নিশ্ছিদ্র ষড়যন্ত্র, পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও তার তল্পিবাহকদের নিঃশর্ত সহায়তার মোকাবেলা যদি আমরা ইস্যুভিত্তিক জজবা ও রাজপথের অগ্নিঝড়া বিবৃতি ও অনলাইনের গরম গরম লেখনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি, নিজেরা সচেতন না হই এবং পরিকল্পনা-মাফিক পাল্টা ধারাবাহিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করি, তবে দ্বীন ও উম্মাহর অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার প্রশ্নে আমাদেরকে করুণভাবে নতি স্বীকার করতে হবে নাপাক মুশরিকদের সামনে। অথচ, দ্বীন ও

উম্মাহর প্রশ্নে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ব্যতীত গায়রতওয়ালা মুসলিম কারও সামনে মাথা নত করতে পারে না।

গেরুয়া রঙে সেক্যুলার হেজেমনি

দিল্লির হিন্দুত্ববাদী দাদাদের কাছে মানবরচিত মানচিত্র বর্গা দিয়ে মসনদ টিকিয়ে রাখার লোভে তাগুত প্রশাসন সেক্যুলারিজম তথা ধর্মনিরপেক্ষতার মতো কুফরি নাস্তিক্যবাদী মতবাদের নাম দিয়ে সংখ্যাগুরু মুসলিমদের ধর্মীয়বোধ ও ধর্মাচরণের সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে। সেই সীমা অতিক্রম করে ইসলামকে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরতে গেলেই মুসলিমদের ঘাড়ে সেক্যুলার হেজেমনির নাম দিয়ে নেমে আসে জঙ্গিবাদী, উগ্রবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, চরমপন্থী, সন্ত্রাসী, সাম্প্রদায়িক উসকানিদাতা-সহ বিভিন্ন নেতিবাচক বিশেষণ।

বিচার বিভাগ, আইন বিভাগ, প্রশাসন, মিডিয়া, শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর উলুহিয়্যাতকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলা এই শাসন কাঠামো আজ এই ভূমির সংখ্যাগুরু মুসলিমদের অধিকার, নিরাপত্তা, সুযোগ-সুবিধাসহ সকল ক্ষেত্রে সমাজের তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে মূল্যায়ন করছে। বিপরীতে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার এদেশীয় এজেন্ট সংখ্যালঘু হিন্দু মুশরিকরা সকল জায়গায় রাষ্ট্রীয় ছত্রছায়ায় নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। তাই ওরা আজ প্রকাশ্যে মুসলিম নিধনের গেরুয়া অপশক্তির জানান দিচ্ছে, মুসলিম নারীদের সম্ভ্রমকে আজ পাইকারি হারে ওদের কাছে বিক্রি হতে দেখেও প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করছে। প্রকাশ্যে ওদের অস্ত্রের মহড়া ও প্রস্তুতির কথাও প্রশাসনের অজানা নয়।

তাই, এই হিন্দুত্ববাদ প্রভাবিত সেক্যুলার হেজেমনি ভেঙে ফেলার পূর্বে যদি আমরা মনে করি, আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে কাজে লাগিয়ে প্রশাসনের উপর চাপ তৈরি করে প্রভাব সৃষ্টি করে দ্বীন ও উম্মাহর মর্যাদা ছিনিয়ে আনব, তবে সেটা বড় রকমের ভুল সিদ্ধান্ত হবে। কারণ, দাদার উপরেও দাদা থাকে।
২০১৩ সালে নাস্তিক্যবাদী শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চে কায়েম করা বামপন্থী হিন্দুত্ববাদী প্রগতিশীল মহলের সেক্যুলার হেজেমনি কাজে লাগিয়েই তাগুত প্রশাসন ইসলামের ব্যানারে তার প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ জামাতে ইসলামির প্রধান নেতাকর্মীদের প্রহসনের বিচারে ফাঁসি দিয়ে দুনিয়া থেকে বিতাড়িত করেছিল।

আবার এই বামপন্থী ইসলাম বিদ্বেষী লেখক ও কলামিস্টদের প্রতিষ্ঠিত সেক্যুলার হেজেমনিকে কাজে লাগিয়েই প্রশাসন ৫ মে এর রাতের আঁধারে হেফাজতে ইসলামের কর্মীদের উপর দেশবিরোধী মৌলবাদী কর্মকাণ্ডের দায় দিয়ে তাদের উপর চালানো হত্যাযজ্ঞের স্টিমরোলারকে বৈধতা দেয়।

এই সেক্যুলার হেজেমনিকে কাজে লাগিয়েই মিথ্যা মামলায় শাইখুল হাদীস ইবনে শাইখুল হাদীস মামুনুল হকসহ কত আলেম ও দায়ী ইলাল্লাহ-কে প্রথমে গুম, পরে জঙ্গি মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে ইউসুফ আলাইহিস সালামের পাঠশালায় অন্ধকার কুঠুরিতে আটক করে রেখেছে প্রশাসন।

আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, এই রাষ্ট্র স্বাধীন নয়, এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডার কাছে জিম্মি হয়ে আছে। কলকাতার দাদা বাবুরা অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই জালিম পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শে দীক্ষিত হতে শিখিয়েছে। এই রাষ্ট্রের পরতে পরতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার গুপ্তচররা কাজ করে যাচ্ছে। এরা আপনার আমার উপর নজর রাখছে। দিল্লির নির্দেশে এরা রাষ্ট্রের উপর নিজেদের প্রভাব তৈরি করেছে। এদেরই ষড়যন্ত্রের বাস্তব রূপ হচ্ছে ফরিদপুর, মধুখালী, ভোলা, নাসিরনগর। এগুলো কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এদের প্রতিটা উসকানিমূলক সাম্প্রদায়িক সহিংসতামূলক কর্মকাণ্ড এই ভূমির মুসলিম উম্মতের ঈমানী গায়রত পরীক্ষার অংশ। যেই মুহূর্তে এরা নিশ্চিত হবে, এদের বাঁধা দেওয়ার, প্রতিরোধ কোনো আদর্শিক, নৈতিক ও সামরিক শক্তি উম্মাহর মাঝে বিদ্যমান নেই, তখনই আপনার, আমার চোখের সামনে এরা মুসলমানের রক্ত নিয়ে হলি উৎসব শুরু করবে, সেই মুহূর্তে হতেই চলমান গাজওয়াতুল হিন্দের চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ্যে আসবে।

এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, এই তাগুত প্রশাসন স্বনির্ভর নয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে ধারণা রাখা সচেতন মুসলিম মাত্রই বুঝবে, বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে এই প্রশাসন জিম্মি। তাই, সেক্যুলার হেজেমনির বয়ানে রাষ্ট্রের উপর চেপে বসা হিন্দুত্ববাদী প্রভাব থেকে প্রশাসনকে মুক্ত না করে প্রশাসন এর

কাছ থেকে নিজেদের দ্বীন ও উম্মাহর ব্যাপারে নিরাপত্তা আশা করা আকাশকুসুম কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়।

এজন্য, সকল দলমত নির্বিশেষে, উম্মাহর এই ক্রান্তিলগ্নে, সকল ইখতিলাফকে পাশে রেখে, সকল ইফতিরাককে মিটিয়ে দিয়ে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সকল উলামায়ে কেরাম একত্রিত হয়ে, এই উম্মতের জন্য আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ নির্ধারণ করে, শুরা কাঠামো গঠন করে, এক আঞ্চলিক আমিরের হাতে বাইয়াত দিয়ে, আল ওয়ালা ওয়াল বারা-র ভিত্তিতে পরিকল্পনামাফিক, গঠনমূলক, সময় উপযোগী, শক্তিশালী কর্মনীতি গ্রহণ করবেন হিন্দুত্ববাদের মোকাবেলায়, এটাই এই উম্মতের একমাত্র চাহিদা এই মুহূর্তে।

তৃষাতুর উম্মাহ

শরীয়াহর ছায়া বঞ্চিত উম্মত শাহবাগী হিন্দুত্ববাদী নাস্তিক ব্লগারদের কাছে নবীজীর অবমাননার প্রতিবাদে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে রক্ত ঝরিয়েছে। ভোলায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে আঘাত করায় প্রতিবাদে ফেটে পড়ে তৌহিদী জনতা। রাজপথে নবী প্রেমে মাতোয়ারা উম্মাহ বুকের তাজা রক্তে সিক্ত করেছে আল্লাহর জমিন। নাসিরনগরে অনলাইনে ইসলামবিদ্বেষী ছবি অনলাইনে প্রচার করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিবেশ সৃষ্টি করেও রেহাই পেয়ে যায় সংখ্যালঘু হিন্দুত্ববাদী মুশরিক আর সব দুর্নাম এসে জোটে ধর্মপ্রাণ মুসলিমের কাঁধে।

গুজরাটের কসাই গেরুয়া মোদীর বাংলাদেশ সফরের প্রতিবাদে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে রক্ত ঝরায় অসংখ্য নামাজি মুমিন মুসলিম।

ফরিদপুরে চাঁদা না দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছুপা রামসেনাদের নিজেদের মূর্তিতে নিজেরাই আগুন দিয়ে নিরীহ দুই মুসলিম যুবককে পিটিয়ে হত্যা করার দায়ে মধুখালীতে প্রতিবাদমুখর তৌহিদী জনতার আত্মত্যাগকে পর্যন্ত মিডিয়াতে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে সর্বোচ্চ।

দীর্ঘকাল ঘুমিয়ে থাকা, নিজেদের অধিকার বঞ্চিত মুসলিম উম্মাহর কাছে আজ শত্রু এবং তাদের ইন্ধনদাতার মুখোশ স্পষ্ট হয়ে গেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলিম রক্তপিপাসু হিন্দুত্ববাদী মালাউনদের ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে উসকানির পাশাপাশি প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে প্রকাশ্য সমর্থন ও স্বেচ্ছাচারী আচরণের কাছে নিজেদের দ্বীন ও উম্মতের ব্যাপারে অবমাননার শিকার হতে হতে শাহজালালের এই বাংলায় বাংলার মুসলিম আজ ক্ষুব্ধ, বীতশ্রদ্ধ, প্রতিবাদের নেশায় উন্মুখ। শত বিভক্ত উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে আজ সঠিক কুরআনি দিকনির্দেশনা ও ফতওয়ার জন্য তৃষিত চাতকের মতো তাকিয়ে আছে ক্লান্ত এই উম্মাহ।

এই উম্মত আজ সমাধান চায়, নিজেদের ন্যায্য ধর্মীয় অধিকার চায়, উম্মাহবোধের জাগরণ চায়। হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের মোকাবেলায় এক উম্মত হিসেবে কাফেলাবদ্ধ হতে দরকার দ্বীন ও উম্মাহর প্রশ্নে আপোষহীন, সময় উপযোগী, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনা। আমাদের নিজেদের থেকেই উঠে আসতে হবে সেই যুগান্তকারী নেতৃত্ব, আমাদের আমির, আমাদের আঞ্চলিক নেতা, যার হাতে বাইয়াত দিয়ে আমরা হিন্দুত্ববাদী গেরুয়া অপশক্তির মোকাবেলা করে কালিমার পতাকার ছায়াতলে গড়ে তুলব ইমারতে ইসলামিয়া বাঙ্গালাহ। গড়ে উঠবে আমাদের আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ, আমাদের শুরা কাঠামো। সকল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চোখে চোখ রেখে সুদমুক্ত যাকাতভিত্তিক অর্থনীতির অধীনে শক্তিশালী উম্মত হিসেবে আমরা আত্মপ্রকাশ করব ইনশাআল্লাহ।

গেরুয়া ম্যাট্রিক্সের দাসত্ব

ইসকনের হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী ও তাদের এদেশীয় পেইড মুরতাদ পেটোয়াবাহিনী-সহ রূপালী ব্যাংকের ৪০ বছর আগের বাতাসি ঋণখেলাপির দায়ে ঢাকায় বাড়ি থেকে মুসলিমদের উচ্ছেদ করার ঘটনায় মিডিয়াপাড়া সরব।

যে ব্যাংকগুলোতে বছরের পর বছর ধরে টাকা জমিয়ে সুদ নিয়ে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত আপনারা, এরাই হিন্দুত্ববাদী দেশীয় এজেন্টদের নির্দেশে আপনার সকল স্থাবর সম্পদ বাতিল করে দিয়ে আপনাকে পথে নামিয়ে এনে নিজ ভূমির উপর আপনার সকল অধিকার খারিজ করে দিতে পারে। আপনার কোনো বৈধ দলিল প্রমাণ আপনার পক্ষে কাজে আসবে না। কারণ এই রাষ্ট্রের বিচারিক কাঠামোতে সুরেন্দ্র কুমার সিনহারা ঘাপটি মেরে আছে। নিরাপত্তা কাঠামোতে হাজারো ওসি প্রদীপরা লুকিয়ে আছে। আপনি স্বাধীন দেশে কুফরি গণতান্ত্রিক সিস্টেমের নিজ ভোটের অধিকার হরণ নিয়ে মাথা গরম করছেন। অথচ এই সিস্টেমটাই হিন্দুত্ববাদীদের নিয়ন্ত্রণে। আপনি আমি এই গেরুয়া ম্যাট্রিক্সের দাসত্বে লিপ্ত।

রূপালী ব্যাংক এর ঘটনার চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে, এদেশের সংখ্যাগুরু মুসলিম অধিবাসীদের নিজেদের ভূমির উপর সকল জন্মগত, আইনগত অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে তাদেরকে বহিরাগত সাব্যস্ত করে সনাতনীদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য দিল্লির কাছে নিজের সম্ভ্রম বিক্রি করে দেওয়া প্রশাসনের পক্ষ থেকে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া।

৯০% মুসলমানের দেশ বাংলাদেশ?

সংখ্যালঘু আসলে কারা?

দেশটা কি আদৌ ৯০% মুসলমানের?

হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়েও নিজেদের কমিউনিটিকে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠায় উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী আদর্শে দীক্ষিত করতে পেরেছে।

বিপরীতে, আমাদের হক্কানী উলামায়ে কেরাম, তাওহীদবাদী ভাইরা, ইমারত-খিলাফত প্রতিষ্ঠায় জিহাদ-কিতালের কথা বললে সবার প্রথমে নামধারী কিছু মুসলিমই দাঁড়িয়ে যাবে বিরোধিতায়।

সেক্যুলার হেজেমনির কাছে নতি স্বীকার করে সংখ্যাগুরু হয়েও আমরা সংখ্যালঘু হিসেবে বাস করছি কথিত দারুল আমানে।

আর সংখ্যালঘু হয়েও দিল্লির কূটনৈতিক তৎপরতায় নাপাক মুশরিকরা আজ আমাদের পরাজিত মানসিকতার সুযোগে অনলাইনে বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশ্যে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠায় মুসলিম নিধনের বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে।

যতদিন না আমরা আমাদের মাথা থেকে '৯০% মুসলিমের দেশ বাংলাদেশ' কথাটি ঝেড়ে ফেলতে পারব, ততদিন পর্যন্ত আমরা নিজেদের দ্বীন ও উম্মাহর অস্তিত্ব রক্ষার তাগাদা অনুভব করব না। কারণ, দেশটা যদি ধরেও নেই ৯০% পার্সেন্ট মুসলিমের দেশ, দেশের শাসনব্যবস্থায় কিন্তু ইসলাম নেই। বরং, আমাদের উপর চেপে রয়েছে হিন্দুত্ববাদী গেরুয়া অপশক্তির প্রত্যক্ষ প্রভাব। তাই শত্রুর মোকাবেলায় '৯০% মুসলিমদের দেশ বাংলাদেশ' কথাটি আমাদের অস্তিত্ব রক্ষায় অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ তো করেই না, বরং আমাদের ঠেলে দেয় শৈথিল্যবাদের দিকে।

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ, প্রস্তুতি নাও!

আমাদের দেশীয় স্বর্ণের বাজারগুলো সব নাপাক মুশরিকদের দখলে।

অপরদিকে আমাদের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা হানিনাট, আতর আর প্রিন্টিং পাবলিকেশন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ।

অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ে মুশরিকদের বিপরীতে আমাদের অবস্থান কতটা নাজুক ভাবতে পারছেন?
বিন লাদেন গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ না থাকলে কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুগের হুবাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আফগান জিহাদ সফলকাম হতো না, গ্লোবাল জিহাদের আনজামও প্রসার পেতো না।

দেশীয় হিন্দুত্ববাদী মুসলিম রক্তলোভী সন্ত্রাসীরা নিজেদের লক্ষ্য স্পষ্ট করে দিয়েছে। এরপরও নিখিল বঙ্গীয় মুসলিম সমাজ ইস্যুকেন্দ্রিক সব আলোচনা, বাহাসে বিলাসী সময় পার করবে। তারপর আসবে সেদিন, যেদিন সংখ্যালঘু নির্যাতনের মিথ্যা নাটক সাজিয়ে একে একে মুসলিম পরিবারগুলোতে ধরে ধরে পুরুষদের হত্যা ও নারীদের ধর্ষণ করা হবে।

হালাকু খানের আগ্রাসনের পূর্বে বাগদাদের কথা স্মরণ করুন। আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেই না।

আপনারা যতটা ভাবছেন তার চেয়েও অনেক বেশি নিকটে চলে এসেছে গাজওয়াতুল হিন্দের চূড়ান্ত পর্যায়।

মার্শাল আর্ট শিখুন। বাড়িতে ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করুন। স্ট্যামিনা বাড়ান। ভারী বস্তু উত্তোলন করুন। শারীরিক পরিশ্রম বাড়িয়ে দিন। নিজেদের অর্থব্যয়কে সীমিত করুন। নিজেদের ঘরগুলোকে নিরাপদ আনসার দুর্গ হিসেবে গড়ে তুলুন। এসবই করুন এদাদের নিয়তে।

কুরবানির ঈদে যত সম্ভব দেশীয় অস্ত্র নিজেদের সংগ্রহে রাখুন। সব কিছু কসাইয়ের জিম্মায় দিয়ে দেবেন না। নিজের পশু নিজে কুরবানি দিন। মনের জোর আসবে।

মনে রাখবেন, মুমিন কখনো কাপুরুষ হয় না। আমরা সিংহের মতো। আমাদের ঈমানী গর্জনে হিন্দুত্ববাদী নাপাক শক্তি লেজ গুটিয়ে পালাবে।

মুখোশ উন্মোচন

হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা যদি আমাদের মূল শত্রু কারা আর পার্শ্বচরিত্রে কারা, সেটা যদি চিনতে ভুল করি, তবে কোনোরূপ প্রতিরোধ দাঁড় করানোর আগেই আমরা হেরে বসব। কারণ পার্শ্বচরিত্রে অংশ নেওয়া এজেন্টরা হিন্দুত্ববাদী মূল শত্রুর পক্ষ থেকে আমাদের বিরুদ্ধে প্রক্সি ওয়ারে লিপ্ত। তাই আবেগের বসে এদের বিরুদ্ধে আমাদের সামর্থ্যের সর্বোচ্চটা ঢেলে দেওয়ার অর্থ—মূল শত্রুকে আরও শক্তিশালী করা।

ভারত উপমহাদেশের বুক থেকে, ইসলাম ও মুসলিমদের চিহ্ন মুছে দিতে আরএসএস, ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনী RAW, দিল্লিকেন্দ্রিক ভারতীয় প্রশাসন, আমলা কাঠামো, আইন ও বিচার বিভাগ, নিরাপত্তা ও সামরিক বাহিনী, কলকাতার দাদাবাবুরা, গেরুয়া রামসেনারা এদের পূর্বসূরি বহিরাগত, প্রাচীন যুদ্ধবাজ, বৈদিক, আর্যদের হাজার বছর পূর্বের সেই আগ্রাসী রক্তপিপাসু নীতিই গ্রহণ করেছে। তাই গাজওয়াতুল হিন্দের এই লড়াইয়ে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর মূল শত্রু তারাই। তারাই আদর্শিকভাবে বাঙালিয়ানার মুখোশে শিরকি হিন্দুত্ববাদী আদর্শ চর্চার প্রতি বেখেয়াল, ঈমানী গায়রতহীন মুসলিম উম্মাহকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাদেরই নির্দেশে মসনদ টিকিয়ে রাখতে এই ভূমির তাগুত শাসকগোষ্ঠী নতজানু হয়ে সাংবিধানিকভাবে অসাম্প্রদায়িকতা চর্চাকে এই উম্মতের উপর বাধ্যতামূলক করেছে, যেন আল ওয়ালা ওয়াল বারা-র আমল ভুলে গিয়ে শত্রুর ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে উম্মাহ বেখবর হয়ে যায়। ভারতের মিডিয়া কালচার আমাদের মনোজগৎকে শিরকি সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। যে জাতির আদর্শিক ভিত্তি দুর্বল, তারা কখনো তাদের নৈতিক অধিকার আদায়ে রক্ত ঝড়াতে পারে না। এজন্যই মুশরিক হিন্দুদের বিরুদ্ধে জিহাদের আলাপ আজ সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক আচরণ হিসেবে মুসলিম সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যারা প্রতিবাদে রুখে দাড়ায়, তাদের আবেগী, অতি জজবাতি হিসেবে আমাদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। মাজলুম ফরজের আমল জিন্দা করতে হলে এই হিন্দুত্ববাদী সেক্যুলার হেজেমনি ভাঙতেই হবে। সারাজীবন নিজেদের সংখ্যালঘু পরিচয়কে সামনে এনে নিজেদের সহায়-সম্পদ, পূজা মণ্ডপে ভাঙচুর করে মুসলিমদের উপর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অভিযোগ তুলে ভিকটিম সাজা হিন্দুরা আজ দিল্লির নির্দেশেই প্রকাশ্যে অখণ্ড

ভারত প্রতিষ্ঠায় মুসলিম নিধনের কথা ঘোষণা দিচ্ছে, মন্দিরে মন্দিরে অস্ত্র জমা করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে, আমাদের মা-বোনদের সম্ভ্রমকে ধূলিসাৎ করে নিজেদের নোংরা লালসা মেটাচ্ছে।

দিল্লির কাছে বিক্রি হয়ে যাওয়া এদেশের তাগুত শাসকগোষ্ঠী, দলগতভাবে মুরতাদ সাব্যস্ত হওয়া দেশীয় নিরাপত্তা, সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনী, ক্ষমতাসীন দলের পালিত মুরতাদ লাঠিয়াল হেলমেট বাহিনী, প্রশাসনের পা-চাটা দেশীয় প্রগতিশীল হিন্দুত্ববাদী সেক্যুলার গোষ্ঠী, সাংস্কৃতিক নাস্তিক্যজোট, সামগ্রিকভাবে এই স্থানীয় হিন্দুত্ববাদী সেক্যুলার ম্যাট্রিক্স এবং স্থানীয় সংখ্যালঘু হিন্দুরা হচ্ছে গাজওয়াতুল হিন্দের লড়াইয়ে আমাদের বিরুদ্ধে প্রক্সি ওয়ারে লিপ্ত পার্শ্বচরিত্র। দিল্লির নির্দেশে এই উম্মাহ এবং দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধে বর্তমানে এরাই প্রত্যক্ষ বিরোধিতায় লিপ্ত। আমরা যদি এদেরকে মূল শত্রু ভেবে এদের বিরুদ্ধে আমাদের সক্ষমতার সর্বোচ্চটা ঢেলে দেই তবে দিল্লির পাতা ফাঁদে নিজেরাই জড়িয়ে পড়ব। এদের বিরুদ্ধে অযথা রক্তপাত আমাদের বাবরি মসজিদ পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করবে না, এদের বিরুদ্ধে আমাদের কুরবানিগুলো হিন্দুত্ববাদী সেক্যুলার হেজেমনির কারণে উম্মতের কাছে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলার দাওয়াত হিসেবে পৌঁছাবে না।

আমাদের বিরুদ্ধে প্রক্সি ওয়ারে লিপ্ত দিল্লির এই এজেন্টদের দ্বীন ও উম্মাহ বিরোধী কর্মকাণ্ডের স্বরূপ তুলে ধরে অনলাইনে এদের মুখোশ উন্মোচন করার পাশাপাশি হিন্দুত্ববাদীদের বিপরীতে নিজেদের সক্ষমতা প্রকাশে অফলাইনে ব্যাপক অ্যাকটিভিজম করে উম্মাহকে ক্রমেই ধেয়ে আসা গাজওয়াতুল হিন্দের প্রকাশ্য লড়াই সম্পর্কে ব্যাপক দাওয়াতি কাজের মাধ্যমে সচেতন করতে হবে। মিম্বরগুলোকে অবশ্যই জিন্দা করতে হবে আলেমদের। আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব ও ধারাবাহিকতা রক্ষায় অবশ্যই শারীরিক, মানসিক, আর্থিক প্রস্তুতি নিতে হবে। স্থানীয় এই হিন্দুত্ববাদী আদর্শের তল্পিবাহকদের প্রতিষ্ঠিত আধিপত্যকে বিনষ্ট করতে পারলে তবেই মূল শত্রু গেরুয়া হিন্দুত্ববাদীরা প্রক্সি ওয়ার রেখে আমাদের বিরুদ্ধে নিজেদের আগ্রাসনকে প্রকাশ্যে আনবে। তখন আমাদেরকে সামর্থ্যের সর্বোচ্চটুকু ঢেলে দিয়ে হিন্দুত্ববাদী শিরকি আদর্শকে তাওহীদের কুঠারাঘাতের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশের বুক থেকে মিটিয়ে দিয়ে ইসলামি ইমারত

প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যুগের হুবাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আরব সালাফি ও কান্দাহারের দেওবন্দী মুজাহিদীন জামাতের রণকৌশল আমাদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, জায়নবাদী জারজ রাষ্ট্র ইজরায়েলের বিপরীতে গাজ্জা যেমন অবরুদ্ধ, হিন্দুত্ববাদী ভারতের বিপরীতে আমরাও তেমন অবরুদ্ধ। আমাদের একেকজনকেও তাই মোহাম্মদ দ্বেইফ, আবু উবাইদা হয়ে উঠতে হবে।

পিনাকীনামা

নিজেদের মন্দিরে নিজেরাই মূর্তি ভাঙচুর করে মুসলিমদের দায় দিয়ে সাম্প্রদায়িক সহাবস্থানের পরিবেশ নষ্ট করা,
আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কটাক্ষ করা,
আম্মাজান আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে অপবাদ দেয়া,
মুসলিম নারীদের সম্ভ্রমহানির ব্যাপারে নিজেদের ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপের তিলকে প্রকাশ্যে তাল বানিয়ে অনলাইনে প্রচার করা,
পূজার অংশ হিসেবে প্রচার করে প্রকাশ্যে মিডিয়া ও নিরাপত্তা বাহিনীর সামনে দেশীয় অস্ত্রের মহড়া চালানো।

অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর দেশীয় নিম্নবর্ণের সংখ্যালঘু হিন্দুরা বারবার এরকম কতশত উসকানিমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশে এক বিরাট সাম্প্রদায়িক সহিংসতার পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। দিল্লির কাছে নিজেদের মস্তিষ্ক বর্গা দিয়ে বসা দেশীয় হিন্দুরা বুঝতে পারছে না প্রাচীন সেই উগ্র হিন্দুত্ববাদ ফিরে আসলে নিম্নবর্ণের এই হিন্দুরাই সমাজে সবচেয়ে নিগৃহীত হবে।

হিন্দুদের এসব উসকানি মূলক কর্মকাণ্ডে বাংলার মুসলিমদের উত্তেজনাকে কাজে লাগিয়ে পিনাকী ভট্টাচার্য মুসলিম রক্তপিপাসু মোদীর মদদপুষ্ট ফ্যাসিবাদী তাগুত সরকারের পতনকেই বাঙালি মুসলিমদের অধিকার আদায়ের পথে মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। দীর্ঘ ১৫ বছরের আওয়ামী জুলুমে উত্ত্যক্ত ঈমান-কুফরের সীমানা ভুলে যাওয়া মুসলিম উম্মাহ বর্তমান জালিম প্রশাসনের পতনের মাধ্যমে কুফরি গণতন্ত্রের মুক্তিকেই নিজেদের অধিকার আদায়ের একমাত্র পদ্ধতি হিসেবে ধরে নিয়েছে।

পিনাকী ভট্টাচার্যকে যদি চিনতে না পারেন, তবে গাজওয়াতুল হিন্দে নাপাক মুশরিক জোটের বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইটা ধরতে পারবেন না। পিনাকী ছিল গণজাগরণ মঞ্চের আহ্বায়কদের একজন। অনলাইনে সে নিজেই নিজের সেই অতীত শাহবাগী শাহবাগ

চেতনার কারণে অনুশোচনা ব্যক্ত করে আবেগী উম্মাহর মন জয় করে নিয়েছে। পিনাকী কি সত্যিই ইসলামবিদ্বেষী শাহবাগীদের ছেড়ে আসতে পেরেছে?

এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে শাহবাগকে চিনতে হবে। জামায়াতের নেতাকর্মীদের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে প্রহসনের বিচারে ফাঁসি দিয়ে বাংলার বুক থেকে হিন্দুত্ববাদকে, ইসলাম অবমাননাকে মিটিয়ে দেওয়ার রাজনৈতিক সক্ষমতাকে ধূলিসাৎ করার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শাহবাগ। ২০১৩ সালের উত্তাল সেই সময়টাতে কলকাতা থেকে ধার করে করে আনা শিরকি বাঙালি পরিচয়ের স্বীকৃতির জন্য শাহবাগে হাজিরা দেয়া ছিল বাধ্যতামূলক। নতুবা স্বাধীনতাবিরোধী লকব জুটে যেত সহজেই। শাহবাগকে পুঁজি করেই সরকার নিজের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের শায়েস্তা করে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। কিন্তু, যখন শাহবাগীদের ইসলামবিদ্বেষী নোংরা রূপটা সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় প্রচার পেয়ে গেল এবং হেফাজত ইসলামের ১৩ দফা আন্দোলনের মাধ্যমে প্রশাসনকে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম উম্মাহ শাহবাগীদের মদদদাতা হিসেবে চিনল, তখন তাগুত প্রশাসন মসনদ টেকানোর লক্ষ্যে শাহবাগীদের কিবলা গণজাগরণ মঞ্চ ভেঙে দেয়। এছাড়াও সরকার যখন মুসলিমদের মন রক্ষায় শাহবাগীদের নগ্ন ইসলামবিদ্বেষ নিয়ে সমালোচনা করল, তখন গণজাগরণ মঞ্চ থেকে প্রশাসনবিরোধী আলোচনাও উঠে এসেছিল। সবাই যখন ভেবেছিল বাংলা জমিন থেকে শাহবাগী নাস্তিক্যজোট আর ফ্যাসিবাদী আওয়ামী সরকারের প্রতিষ্ঠিত সম্মিলিত সেক্যুলার হেজেমনির কবলে পড়ে ইসলাম ও মুসলিম সত্তা মুছে গিয়ে উদারতা ও মুক্ত চিন্তা চর্চার নাম দিয়ে হিন্দুয়ানি বাঙালিয়ানা চর্চার মধ্য দিয়ে হিন্দুত্ববাদী আদর্শের স্ফুরণ ঘটবে, তখনই হেফাজত আন্দোলনে আপামর মুসলিম উম্মাহ ও শাতিমে রাসূলের প্রায়শ্চিত্যদানকারী তাওহীদি গুরাবা ভাইদের কুরবানির বদৌলতে ইসলামের এক সুশীতল বাতাস বইতে শুরু করে, মুসলিম উম্মাহ বিশেষ করে কলেজ ভার্সিটির জেনারেল শিক্ষার্থীরা জাহিলিয়াত ছেড়ে ব্যাপকভাবে তাওহীদের কাফেলায় এসে শামিল হয় দ্বীন ইসলামের মর্যাদা রক্ষায়। এসময় থেকেই শাহবাগীরা দুইটি জোট পৃথক হয়ে যায়,

১. আওয়ামীপন্থী শাহবাগী,

২. আওয়ামী-বিরোধী শাহবাগী,

পিনাকী ভট্টাচার্য দ্বিতীয় দলভুক্ত।

শাহবাগীরা মৌলিকভাবে নাস্তিক্যবাদের লেবাসে হিন্দুত্ববাদী আদর্শের পক্ষে ছিল। এদের প্রতিষ্ঠিত সেক্যুলার হেজেমনিও মূলত হিন্দুত্ববাদ বিরোধী যেকোনো চেতনার বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক হাতিয়ার স্বরূপ। কিন্তু ইসলামবিদ্বেষী মুখোশ খসে পড়ায় যখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে, শাহবাগ থেকে কখনোই অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার আদর্শিক বাতায়ন প্রতিষ্ঠা সম্ভব না, তখনই মুখোশ বদলে নিজের পূর্বের শাহবাগী কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে বাঙালি আবেগী মুসলিমদের মন রক্ষা করে পিনাকী।

তারপর থেকেই সে শাহবাগের ভিত্তি নির্মূলকারী ফ্যাসিস্ট সরকার দমনে অ্যাকটিভিজম শুরু করে অনলাইনে। খোঁজ রাখলে জানবেন যে, নিজের প্রতিষ্ঠিত ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিটিও বিসর্জন দিতে হয়েছে এজন্য তাকে। গণমানুষের কাছে আজ সে উম্মাহর অধিকার আদায়ের অগ্রবর্তী সেনা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। দল বদলে সে আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাবেদারিতে লিপ্ত। উম্মাহর সামনে এমন এক ন্যারেটিভ প্রতিষ্ঠা করেছে যে, ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনে দরকার হলে পশ্চিমা জোটের করালগ্রাসে আপতিত হলেও শান্তি। কারণ পশ্চিমাজোট নাকি মুক্তির দূত হয়ে এসে দেশে কুফরি গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে দেশ ও জনগণের অধিকার নিশ্চিত করবে। পিনাকী ভট্টাচার্য কত জনহিতৈষী তাই না?

আমার লেখায় পূর্বেই বিস্তারিত তুলে ধরেছি, যে দিল্লির নির্দেশে দেশীয় হিন্দুরা মুসলিমদের তাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে উসকানি মূলক আচরণ করছে, যেন করে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে পুঁজি করে বিশ্বজুড়ে চলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মৌনতা অবলম্বন করা বিশ্বমানবতার করুণা ভিক্ষা করে সমাধান স্বরূপ সংখ্যালঘু হিন্দুরক্ষায় পার্শ্ববর্তী মুসলিম রক্তলোভী হিন্দুত্ববাদী ভারতের নাপাক হস্তক্ষেপের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। খেয়াল করলে দেখবেন, পিনাকীও সেই একই দৃষ্টিভঙ্গির দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে ভিন্ন সুরে, ভিন্ন ভাষায়। জি, পিনাকী ভট্টাচার্য একজন অখণ্ড ভারতের আদর্শে বিশ্বাসী হিন্দুত্ববাদী। সেক্যুলারিজমের ফরাসি ধর্মবিদ্বেষী রূপটা নয়, বরং বাঙালি মুসলিমদের মন জয় করতে কৌশলী হয়ে 'সকল ধর্মের প্রতি সম্মান,

কারণ সকল ধর্ম নৈতিকতা, মানবিকতা শেখায়’ এই উদারতার নাম দিয়ে সেক্যুলারিজমের যে আমেরিকান রূপটা রয়েছে, সেটা চর্চা করে পিনাকী। আর বাঙালি সেক্যুলারিজম বলতে কেবল শাহবাগীদের ইসলামবিদ্বেষী রূপটাই চেনে। যদি আপনি সজাগদৃষ্টি সম্পন্ন মুসলিম হন, খেয়াল করবেন যে শাহবাগীদের ইসলামবিদ্বেষী রূপের সমালোচনা করলেও লুক্কায়িত হিন্দুত্ববাদী চেতনা সামনে আনে না পিনাকী। মোদীর মুসলিমবিদ্বেষী রূপের বিরোধিতায় বয়কট ভারত আন্দোলনের সূচনা করলেও ভারতের হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসী সাধারণ জনগণকে নিরীহ হিসেবেই দেখে সে। মনে রাখবেন, ভারত মানেই মোদী নয়। কেবল মাত্র মোদীই অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠায় হিন্দুত্ববাদী আদর্শে দীক্ষিত নয়। বরং, এটা বলাই উত্তম যে, বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন থেকে বেঁচে থাকতে আরএসএস মুসলিম নিধনে বদ্ধপরিকর মোদীর বিজেপিকে ব্যবহার করছে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠায়, আর বিজেপি ব্যবহার করছে সাধারণ হিন্দু জনগণদের। যেমনটা তারা আগে কংগ্রেসকে ব্যবহার করেছে। সিকিম ও পাঞ্জাব অধিগ্রহণের ইতিহাস ঘাটলেই বুঝতে পারবেন ব্যাপারটা। এমনকি ফরিদপুরে নিরীহ দুই মুসলিম হত্যার পরও সে স্থানীয় উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের ব্যাপারে শিথিলপন্থী আচরণ করে পাশ কাটিয়ে গিয়েছে চতুরতা অবলম্বন করে। এহেন পরিস্থিতিতে ভারতীয় পণ্য বয়কটের পাশাপাশি দেশীয় হিন্দুদের সাথে সকল ধরনের লেনদেন বন্ধের কোনো ডিসকোর্স কিন্তু সে উপস্থাপন করেনি।

ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উপর জুলুমের কারণে সারা বিশ্বজুড়ে ইজরায়েলি পণ্য বয়কটের ডাক যেভাবে সফলতা দেখেছে, ভারতীয় পণ্য বয়কটের ডাক আদৌ কি তেমন সফলতার মুখ দেখবে? ভারতের বাণিজ্য বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। ভারতের ইসলাম ও মুসলিমবিদ্বেষ বিশ্বজুড়ে কতটুকু প্রচারিত? শুধু বাংলাদেশে ভারতীয় পণ্য বয়কট করে ভারতকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করার ন্যারেটিভ কতটুক বাস্তবসম্মত? তার চেয়ে হাজার হাজার ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী আদর্শে দীক্ষিত বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত গুপ্তচর, যারা আমাদের দেশে উপার্জিত অঢেল অর্থ পাঠিয়ে আমাদের শত্রুকে আমাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী করছে, তাদের ধরে ধরে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। দেশীয় হিন্দুদের সাথে লেনদেন সীমিত ও ক্ষেত্রবিশেষে বন্ধ করে এদের পেটে লাথি দিয়ে ভাতে ও পানিতে মারা হোক।

জিহাদের ফরজিইয়্যাত আদায় করতে ভুলে যাওয়া তাওহীদি আদর্শবিহীন উম্মতের ঈমানী জজবাকে ভারতীয় পণ্য বয়কটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করার মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদের মোকাবেলায় এই উম্মতকে এদাদের ফিকির থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে পিনাকী। একই সাথে ভারতীয় পণ্য বয়কটের ডিসকোর্সকে ব্যাপক আকারে প্রচার, প্রসার করে হিন্দুদের বিরুদ্ধে যেকোনো উসকানিতে বাস্তবতা বিবেচনা না করেই সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার জন্য উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে পিনাকী।

মুসলিমদের আবেগ নিয়ে ছলচাতুরীর আশ্রয় নেওয়া পিনাকী ভট্টাচার্যের সুশীল বক্তব্য শুনে ধর্মীয় জ্ঞানবিহীন মুসলিম উম্মাহ তো তাকে ধরে বেঁধে ঈমানদার হিসেবে সাব্যস্ত করা শুরু করে দেয় এবং এটার বিরোধিতা সে নিজেই করে নিজের উচ্চবর্ণের হিন্দু পরিচয়কে গর্বের সাথে সামনে এনে। ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতা-বিরোধী ইস্যুতেও কিন্তু পিনাকীর অবস্থান আমাদের বিপরীতেই।

ভারত এর কোনোরূপ সহযোগিতা ছাড়াই পিনাকী কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতে গিয়ে, সেখান থেকে ফ্রান্সে হিজরত করেছে বলে মনে করেন আপনারা? যদিও সে বলছে তার আত্মগোপনের পেছনে শিবিরের সহায়তা আছে, যেখানে শিবির নিজেই সাংগঠনিকভাবে ফ্যাসিস্ট তাগুত সরকার ও মুরতাদ ছাত্রলীগের আগ্রাসনে নতজানু অবস্থায় রয়েছে। তার এই দাবির মাধ্যমেই প্রমাণ করে দিয়েছে শাহবাগী আদর্শ সে ভুলতে পারেনি। নাহলে আবারো সেই প্রশাসনের কাছে শিবিরকে অপরাধী বানানোর পুরোনো শাহবাগী ন্যারেটিভ সে সামনে আনতো না।

আরেকটা বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই লেখার ইতি টানতে চাই। ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে শুধু পিনাকী ভট্টাচার্য নয়, সাংবাদিক ইলিয়াস হোসেনও সরব ভূমিকা পালন করে। যদিও দুজনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ভিন্ন। তবে ইলিয়াস হোসেনের উদ্দেশ্য ধরতে খুব বেশি ধূর্ত হতে হয় না এবং আপাতদৃষ্টিতে সে ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য পিনাকীর মতো ক্ষতিকর নয় বলে, তার ব্যাপারে আলোচনা টানছি না। তবে খেয়াল করলে দেখবেন যে, ইলিয়াস হোসেনের বিরুদ্ধে প্রশাসন বেশ কঠোর অবস্থানে এবং মসনদ টেকানোর দেনদরবারে হোয়াইট হাউসকে রাজি করিয়ে সুযোগ মতো

ইলিয়াসকে বেশ ভোগান্তিতে ফেলতে পারলেও পিনাকীকে তেমন ঝামেলা পোহাতে হয় না। কারণ দাদার উপরেও দাদা থাকে। সেই মসনদ টেকানোর দেনদরবারেই পরাস্ত হয়ে পিনাকীর 'কাঁঠাল রানী' খেতাব হজম করতে হয়। আপনাদের হয়তো জানা আছে, ফ্রান্সের সাথে কিন্তু ভারতের কুটনৈতিক সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার।

রাজনীতির গোলকধাঁধা

‘যুদ্ধ নয় শান্তিতে বিশ্বাসী’ রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী এলাকার নাগরিক হিসেবে আপনি নিজেকে কতটুকু নিরাপদ মনে করেন, যেখানে হিন্দুত্ববাদী আদর্শে দীক্ষিত ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বিএসএফ কিছুদিন পরপরই পাখির মতো হত্যা করে আপনার স্বজাতিদের? কাঁটাতারে ঝুলন্ত ফেলানীর লাশ নিশ্চয়ই আপনারা ভুলে যাননি?

ভারতীয় প্রশিক্ষণে বলীয়ান পার্বত্য অঞ্চলে কুকিচিন বাহিনীর চোরাগোপ্তা হামলার সামনে হাজারো অস্ত্রে সুসজ্জিত আমাদের সেনাবাহিনীর অপদস্থতা কি আমাদের প্রশাসনিক কূটনীতির নতজানু চেহারাই উন্মোচন করে দেয় না?

প্রশাসনের অভ্যন্তরে ওসি প্রদীপদের মতো হিন্দুত্ববাদীদের কী পরিমাণ দোর্দণ্ড প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত থাকলে পরে মেজর সিনহার মতো সামরিক ব্যক্তির জীবনের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয় প্রশাসন, ভাবা যায়?

ভারতের নতুন সংসদে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটানের সার্বভৌমত্ব মুছে দিয়ে একত্র করে অখণ্ড ভারতের মানচিত্র উপস্থাপন নিয়ে নেপালসহ অন্যান্য দেশের পক্ষ থেকে গুজরাটের কসাই মোদীর কাছে যৌক্তিক ব্যাখ্যা তলব করা হলেও, বাংলাদেশ থেকে কোনো ধরনের জোরালো আপত্তি তো জানানো হয়নি বরং, মূলধারার মিডিয়া ও সংবাদপত্রগুলোর প্রশ্নবাণ এড়াতে পররাষ্ট্র সচিব দায়সারা গোছের এক বিবৃতি দিয়ে যোগ্য বন্ধু প্রতীম রাষ্ট্রের পরিচয় দিয়েছে।

রাতের ভোটে মসনদ দখল করার ইতিহাস সৃষ্টি করে জনগণের কুফরি গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করার পাশাপাশি মসনদ টেকানোর জন্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে তাগুত সরকারের দিল্লির হিন্দুত্ববাদী প্রশাসনের কাছে জিম্মি থাকার বিষয়টা যে আজ এই ভূমির উম্মতে মুসলিমার কাছে স্পষ্ট, সেটা তাগুত প্রশাসনের অজানা নয়। তাই তো, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে শুরু করেছে আবারো। কওমি সনদ প্রদান, শোকরানা মাহফিলের আয়োজন, দেশজুড়ে ৫০০ মডেল মসজিদ নির্মাণ শাতিমে রাসূল থাবাবাবা রাজীব হায়দারকে শহীদ (?!) খেতাব দেওয়া এই তাগুত সরকারের হাতে

লেগে থাকা ২০১৩ সালের ৫ মে শাপলা ও ৬ মে মাদানীনগরের শহীদদের রক্তের দাগ যেভাবে মুছে দিয়েছিল, ঠিক একইভাবে শাইখুল হাদীস ইবনে শাইখুল হাদীসের মুক্ত বাতাসে ফিরে আসা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি গভীর রাজনৈতিক পদক্ষেপ। বাঙালি মুসলিম ইমারত-খিলাফত এর আবেগ ধারণ করলেও, রাজনীতির মারপ্যাঁচ বুঝতে ভুল করে বলেই, তাদের ধর্মীয় আবেগকে পুঁজি করে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের নোংরা খেলা বুঝতে ভুল করে সবসময়।

প্রশাসনের সকল গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে দিল্লির নির্দেশে RAW, আরএসএস, ইসকন এজেন্টদের অন্তর্ভুক্তি এবং কিছুদিন পরপর সুব্রামানিয়াম স্বামীর মতো বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদদের মুখ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দেশীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের মঞ্চায়িত নিরাপত্তাহীনতা দূরীকরণে বাঙালি মুসলিম নিধন করে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার যেই প্রকাশ্য হুমকি শুনতে পাওয়া যায়, তা সত্যিকার অর্থেই কাঁঠাল রানীর বড় দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় চক্রান্তে ২০০৯ সালের বিডিআর বিদ্রোহের মাধ্যমে দেশপ্রেমিক সেনানায়কদের হারানোর স্মৃতি আজও তাজা আছে বলেই গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্রের মতো কুফরি আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত মানবরচিত সংবিধানকে প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা দিতে বাইয়াতবদ্ধ থাকার পরও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সেনাবাহিনীর উপর ভরসা করতে পারছে না প্রশাসন। অবস্থা দাঁড়িয়েছে, "সর্ব অঙ্গে ব্যথা, ঔষধ দিব কোথা?" তাই তো হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের নেশায় উত্তপ্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের প্রাণের নেতা, মাওলানা মামুনুল হককে মুক্ত আকাশের নিচে ফিরিয়ে দিয়ে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় কুরবানি দিতে সক্ষম জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসন খুব ভালো করেই জানে, সারা বছর দেশপ্রেমের রচনায় ফুল মার্কস পেলেও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় হিন্দুত্ববাদের মোকাবেলায় দেশীয় সেক্যুলার সুশীল জনগোষ্ঠী যথেষ্ট নয়। এরা বরং চূড়ান্ত মুহূর্তে গাদ্দারি করবে। অপরদিকে ;দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ'(?!) শীর্ষক চেতনাকে পুঁজি করে দেশের মুসলিমদের তাদের প্রাণের রাহবারের অধীনে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় শত্রুর মোকাবেলায় নামিয়ে দেওয়া অধিক নিরাপদ ও যৌক্তিক।

শক্তিশালী আদর্শিক অবস্থান, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও নববী মানহাজে প্রত্যাবর্তন ব্যতীত মঞ্চ কাঁপানো জজবাপূর্ণ হুঙ্কারে প্রতিবাদের বারুদ ছড়িয়ে পড়লেও, অগ্ন্যুৎপাতের গলিত লাভার মতো তা ক্ষতি সাধন করে না তাগুতি জীবনব্যবস্থার। মুমিন কখনো দুর্বল হয় না। যেখানে আমাদের সকলের সিংহের মতো মাথা উঁচু করে বাঁচার কথা ছিল, আমাদের গর্জনে বাতিলের সকল অহমিকা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, সেখানে আমরা আজ গৃহপালিত পোষ্য প্রাণীতে পরিণত হয়েছি বলেই, শাইখুল হাদীস ইবনে শাইখুল হাদীসের গর্জনকে আমাদের কাছে বনের রাজার হুঙ্কারের মতো শোনায়।

শাহবাগীদের বিপরীতে এই উম্মতকে ঈমানী চেতনার ভিত্তিতে, নবীপ্রেমে মতিঝিলে ঐক্যবদ্ধ করতে পারা ছিল হেফাজতে ইসলামের এক বিশাল খিদমত। দশকের পর দশক ধরে নিজেদের ধর্মীয় অধিকার বঞ্চিত উম্মতের মনে এক আশার সঞ্চার হয়েছিল। হেফাজতে ইসলাম উম্মতের সেই আশা আকাঙ্ক্ষার মর্যাদা রাখতে পারেনি। শাপলা হত্যাকাণ্ডের এক দশক পেরিয়ে গেলেও প্রকৃত শহীদদের কোনো লিস্ট তারা দিতে পারেনি, শহীদদের পরিবারের পাশে তারা দাঁড়াতে পারেনি। এই ঘটনাগুলো হেফাজতে ইসলামের বিরুদ্ধে সেক্যুলার হেজেমনিকে আরও শক্তিশালী করছে। তাই ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, পুনরায় হেফাজতে ইসলামের কোনো কর্মসূচিতে নিজেদের সম্পৃক্ত করা আমাদের উচিত হবে না।

আমাদের অবশ্যই বুঝতে পারতে হবে, অধিকার আদায়ে গণতান্ত্রিক সিস্টেম সমর্থিত মিছিল-মিটিং কিংবা কোনো রাজনৈতিক বিপ্লবের পথে ঝড়ে পড়া রক্ত দিয়ে নয় বরং কিতালের মাধ্যমে শাহাদাতের মর্যাদা লাভের মাধ্যমেই এই উম্মতের সকল জিল্লতি দূর হয়ে, ধর্মীয় অধিকার ফিরে আসবে।

আমাদের পরিবারগুলোকে অবশ্যই হিন্দুত্ববাদের মোকাবেলায় দ্বীন ইসলামের প্রহরায় শক্তিশালী দুর্গ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের পরিবার পরিকল্পনার পেছনে সময় দিতে হবে। নিজেদের সন্তানদেরকে মুজাহিদ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। ছোট থেকেই আমাদের সন্তানরা নামাজের আহকাম-আরকান যেভাবে জানবে, জিহাদ ফরজ হওয়ার শর্ত সেভাবে জানবে, আল ওয়ালা ওয়াল বারা সেভাবে জানবে।

শেষ নিবেদন

ও মুসলিম জাতি,
তোমরা যখন তারাবির নামাজ কত রাকাত, কে জাহমিয়া আর কে মুশাব্বিহা-মুজাসসিমা নিয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মধ্যে বিরোধে লিপ্ত, তোমারই মুসলিম ভাই হিন্দুত্ববাদী গেরুয়া সন্ত্রাসীদের হাতে নির্মমভাবে হত্যার শিকার হচ্ছে। পুলিশ-প্রশাসনও এই নাপাক মুশরিকদের ঔদ্ধত্যের সামনে নতজানু হয়ে পড়েছে। শত শত বছর ধরে চলে আসা আকিদাগত ও ফিকহি ইখতিলাফকে মিটিয়ে ঐক্যের স্বপ্ন দেখা নিজেদেরকে আত্মপ্রবঞ্চনা দেওয়ার মতোই। বরং, ইখতিলাফই শরীয়তের সৌন্দর্য।

সকল ইখতিলাফকে পাশে রেখে কিয়ামুল লাইলে অশ্রুঝড়া নয়নে নিজেদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এবং ঈমানী বেগায়রতের জন্য আল্লাহর কাছে তওবা করে হিন্দুত্ববাদী অপশক্তির মোকাবেলায় আসমানি মদদের জন্য দুয়া করো।

নিজেদের ঘরগুলোকে আল ওয়ালা ওয়াল বারা-র দীক্ষায় তাওহীদের দুর্গ হিসেবে গড়ে তোলো।

শারীরিক ও মানসিকভাবে এই নাপাক মালাউনদের সংহারের জন্য প্রস্তুতি নাও।

নিজের জিসিমগুলোকে ঢাল বানাও আর হাতগুলো ধারালো তরবারি বানাও, যেন হিন্দুত্ববাদী রামসেনাদের গর্দানে আঘাত করতে পারো।

মাহদির কাফেলায় সৈনিক তোমরাই।
শত বছর ধরে খিলাফতের ছায়া বঞ্চিত মাজলুম এই উম্মাহ তোমাদের দিকেই প্রবল উৎকণ্ঠায় তাকিয়ে আছে।

কাতারবদ্ধ হও, তাওহীদের ভিত্তিতে কাফেলাবদ্ধ হও।

বুদ্ধিবৃত্তিক হিন্দুত্ববাদী সেক্যুলার হেজেমনি ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও।

পুঁজিবাদী বিশ্বের দাসত্বের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলে ইমারত-খিলাফত প্রতিষ্ঠা করো।

নমরুদ ও তার অনুসারী মুশরিক সম্প্রদায় যেমন ব্যাবিলনের বুকে মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে দুনিয়ার বুক থেকে ইসলামকে মিটিয়ে দিতে চেয়েছিল, ঠিক তেমনি করে আধিপত্যবাদী বহিরাগত আর্যদের আবাদ করা বৈদিক ধর্মমতকে আদিধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম ও মুসলিমদেরকে ছিন্নমূল বানিয়ে হিন্দের ভূমি থেকে তাওহীদের বয়ানকে মিটিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে বছরের পর বছর জুড়ে।

বিরোধটা যখন আদর্শিক, সংঘাত তখন অনিবার্য। এক ঐতিহাসিক অস্তিত্বের লড়াইয়ের মুখোমুখি দুটি জাতি। ইতিহাসের প্রেক্ষাপট থেকে ইসলামের লেন্সে রাজনীতির পাঠ নিতে না পারলে ময়দানের লড়াইয়ে আপনি হেরে বসবেন। বইটির পাতায় পাতায় উঠে আসা উম্মাহর তিক্ত বাস্তবতা, অনাগত ভবিষ্যতের সতর্কবার্তা, নাজুক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে দরদমাখা আহ্বান, বিজয়ী মানসিকতা আবাদের দাওয়াত, নববী পন্থায় উম্মাহর করণীয় নির্ধারণ আপনাদের মস্তিষ্কের জড়তা দূর করবে ইন শা আল্লাহ।